Contents

সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি



মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি

(২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার থেকে ২০০৬ সালের ৯ই জুলাই রবিবার)
[১ বছর ৪ মাস ১৭ দিন]

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৪
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৫২
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

ذكرى السجن لستة عشر شهرًا ونصف

تأليف : محمد نور الإسلام
السكرتير العام لجمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
রবীউল আউয়াল ১৪৩৭ হি.
পৌষ ১৪২২ বঙ্গাব্দ, জানুয়ারী ২০১৬ খ্রি.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

Share Sholo masher kara smriti by **Muhammad Nurul islam**. Secretary Genaral, Ahlehadeeth Andolon Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

‘কারাস্মৃতি’ বলতেই বন্দীজীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সমূহের বর্ণনা বুঝায়। আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। সে কখনো আবদ্ধ থাকতে চায় না। তাই তাকে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বন্দী রাখাটাই বড় শাস্তি। দু’বেলা দু’মুঠো খেতে পেলেও স্বাধীনতা না থাকায় সে ভিতর থেকে মরে যায়। তার স্বাধীন চেতনা ক্রমে বিলুপ্ত হয়। সম্ভবতঃ এরূপ মন্দ চিন্তা থেকেই আধুনিক বিশ্বের কপট চিন্তাবিদরা বিনা বিচারে মেয়াদ বিহীন হাজতী প্রথা, রিম্যাণ্ডে নির্যাতন প্রথা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রথা প্রভৃতি নিপীড়নমূলক বিধানসমূহ চালু করেছে। ফলে কারাবন্দী মানুষগুলিকে তাদের জৈবিক ও মানবিক চাহিদা থেকে যেমন বঞ্চিত করা হয়, তেমনি স্ব স্ব পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি অপরিহার্য দায়িত্ব পালন থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। এগুলি যে মৌলিক মানবাধিকারের চরম লংঘন, একথা চিন্তাশীল মাত্রই বুঝতে পারেন।

বন্দী রাখার উদ্দেশ্য যদি সংশোধন হয়, তবে তার কোন ব্যবস্থা কারাগারে আছে কি? অনুতপ্ত ও সংশোধিত হলে তাকে মুক্তি দেওয়ার বা সাজা কমানোর কোন বিধান আছে কি? আদালতে বাদী ও বিবাদীকে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে যা দু’দিনেই মিটে যাওয়া সম্ভব, সেটা প্রচলিত ওকালতি ব্যবস্থা ও আদালতের দীর্ঘসূত্রী প্যাঁচে ফেলে বিনষ্ট করা কি অযৌক্তিক ও অমানবিক নয়? এটি আরও অমানবিক হয়, যখন স্বয়ং সরকার মিথ্যা মামলা দিয়ে তার নাগরিকদের হয়রানি করে। অতঃপর জনগণের ট্যাক্সের পয়সা এই অন্যায় কাজে ব্যয় করে। আরও মর্মান্তিক হয়, যখন এই মিথ্যার পিছনে পুরা বিচার বিভাগ নিয়োজিত হয় ও তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে বন্দীরা কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে মরে। সেকারণ অভিজ্ঞ জেলারদের মতে কারাগারের ৯০ শতাংশ বন্দী নিরপরাধ।

এমনই এক সরকারী যুলুমের শিকার হয়েছিল ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর নিরপরাধ নেতৃবৃন্দ। অবশেষে আল্লাহ্র রহমতে মযলূম বিজয়ী হয়েছে ও যালেম পরাজিত হয়েছে। কিন্তু সিস্টেমের পরিবর্তন হয়নি। তাই আমরা ইসলামের আলোকে দেশের অত্যাচার মূলক আইন ও বিচার ব্যবস্থা এবং কারাবিধি সমূহের আশু পরিবর্তন কামনা করি।

সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতিতে লেখক সহ সংগঠনের সে সময়কার কেন্দ্রীয় তিন নেতার মর্ম কাহিনীর কিছু নমুনা বর্ণিত হয়েছে। সংগঠনের ‘আমীর’ ও অন্যান্য নির্যাতিতদের কাহিনী এতে যুক্ত হয়নি। সুযোগ হ’লে পরবর্তীতে সেগুলি একত্রিত করা যাবে। সে সময়কার কথিত সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়া সমূহের এক চোখা ভূমিকা সমূহ এখানে যোগ হয়নি। ভবিষ্যৎ বংশধররা সেগুলি না জানলেই বরং ভাল থাকবে।

নির্যাতিত লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তিনি শ্রম স্বীকার করে ফেলে আসা অনেক অজানা তথ্য পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। যদি এর মাধ্যমে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলনে’র কর্মীরা কিছু পাথেয় খুঁজে পান, তাহ’লে তাঁর এই শ্রম স্বার্থক হবে বলে মনে করি। কপট, শৈথিল্যবাদী, চরমপন্থী ও বিভেদকামীদের অপচেষ্টা থেকে আল্লাহ ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’কে রক্ষা করুন- আমীন!

বিনীত

প্রকাশক

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

ফেব্রুয়ারী আসলেই কেন যেন মনের কোণে জেগে ওঠে তৌহীদি শিহরণ। জান্নাত পিয়াসী মানুষের অন্তরে উত্থিত হয় অগ্রযাত্রার আলোড়ন। জান্নাতের পথযাত্রী যুব কাফেলার জীবনে জাগে অফুরন্ত জাগরণ। ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বাংলার তরুণ ও যুবকদের পথের দিশারী হিসাবে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পদযাত্রা শুরু হয়। আর এ মাসেই অধিকাংশ সময় সংগঠনের বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যে কারণে ফেব্রুয়ারীকে ভোলা যায় না।

২০০৫ সালের ২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার ছিল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ১৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার ধার্য তারিখ। এ মাসের প্রথম থেকেই সারা দেশে সাজ সাজ রব পড়ে যায় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদানের জন্য। কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল হিসাবে আমাকে দু'দিন আগেই যেতে হবে। তাই ২২ তারিখ মঙ্গলবারেই আমি রাজশাহী পৌঁছে গেলাম। নওদাপাড়া মাদরাসার দিকে নযর পড়তেই দেখি বহু পুলিশের আনাগোনা। জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, ইজতেমার নিরাপত্তার জন্য আমরা এসেছি।

গ্রেফতার হ'লাম :

অতঃপর রাত যত বেশী হয়, নিরাপত্তা বেষ্টনী তত বৃদ্ধি পায়। আমি দারুল ইমারতে বসে ইজতেমার অনুষ্ঠানসূচী তৈরী করছি। ইতিমধ্যে ঘড়ির কাটা রাত দেড়টার ঘরে। হঠাৎ করে আমার রুমে এসে একজন পুলিশ বলল, আমীরে জামা'আত কোথায় আছেন? বললাম, কেন? আপনাদের ইজতেমার অনুমতি বাতিল হয়েছে। এক্ষুণি কমিশনার স্যারের নিকট যেতে হবে। সরল মনে আমি মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে ডাকতে উপর তলায় তাঁর বাসায় যাচ্ছি। পিছনে তাকিয়ে দেখি, পুলিশের কয়েকজন বড় অফিসার আমার সাথে। আমীরে জামা'আত লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় দরজা খুললে একজন অফিসার সালাম দিয়ে বলল, কমিশনার স্যার আপনাকে সালাম

দিয়েছেন। তাঁর সাথে একটু দেখা করতে যেতে হবে। আমীরে জামা'আত বললেন, সকালে যাব। আমি কমিশনার ছাহেবের সাথে এখন কথা বলে নিচ্ছি। তখন আরেক অফিসার সালাম দিয়ে বললেন, স্যার আমাদের কিছু করার নেই, উপরের নির্দেশ। স্যার বুঝতে পারলেন, এরা তাঁকে গ্রেফতার করতে এসেছে। তাই আমাকে কিছু না বলেই তিনি ভিতরে গিয়ে পোষাক পরিবর্তন করে দ্রুত চলে এলেন।

অতঃপর স্যার পুলিশের সাথে চলে গেলে আমি বিমর্ষ অবস্থায় নীচে অফিসে বসে আছি। এমন সময় কয়েকজন পুলিশ এসে বলল, স্যার একা একা কেমন করে ফিরে আসবেন, তাই আপনাকেও সাথে যেতে বললেন। আমি তাদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। আম চত্বরে যেতে যেতে দেখি, মারকাযের প্রতিটি পয়েন্টে পুলিশ। ছাদে, গাছের উপরে, মসজিদের কোণায় সর্বত্র পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ। যেন রণক্ষেত্র।

একজন পুলিশ অফিসার মোবাইলে বলছেন, কেমন ইনফরমেশন! আমরা তো দেখছি সবাই সহজ-সরল মানুষ। একজন রাগ করে বললেন, যতসব বাজে কথা। আমাকে বলা হ'ল তারা খুব দুর্ধর্ষ, বহু অস্ত্র মজুদ আছে তাদের কাছে। দু'চার, দশ ঘণ্টা যুদ্ধ হ'তে পারে। প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন। এখন দেখছি সব ভুয়া কথা। ভুল ইনফরমেশন। যত্ত সব...'। এই বলে তিনি রাগে গরগর করতে করতে গাড়িতে এসে বসলেন।

অতঃপর তারা আমাকে ও সালাফী ছাহেবকে পৃথক গাড়িতে বোয়ালিয়া থানায় নিয়ে গেল এবং ওসির কক্ষে বসিয়ে রাখল। পরে জানলাম যে, আমীরে জামা'আত ও আযীযুল্লাহকে পৃথক গাড়িতে রাজপাড়া থানায় নিয়ে গেছে। পরদিন সকালে আমাদের কোর্ট হাজতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে আমরা বারান্দায় চারটি চেয়ারে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ বসে আছি। হাজতের চারপাশে মানুষের উপচে পড়া ভিড়। সবাই অপলক নেত্রে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। দু'একজনের চোখ দিয়ে নীরবে অশ্রু ঝরছে। হঠাৎ মানুষের ভিড় ঠেলে আমাদের জানালার সামনে এসে সালাম দিলেন এক নওজোয়ান। দীর্ঘদেহী উক্ত যুবকের চেহারায় ফুটে উঠেছে বিষাদের চিহ্ন। মনে বইছে আবেগ আর প্রতিবাদের প্রবল ঝড়। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর

বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে উঠল, 'স্যার! চিন্তা করবেন না। জোট সরকার কোন ক্ষতি করতে পারবে না *ইনশাআল্লাহ*! জানতে চাইলাম, তিনি কে? উত্তর আসলো 'খায়রুযযামান লিটন' [পরবর্তীতে (২০০৮-১৩) সিটি 'মেয়র']।

জীবনে কোর্ট-কাচারীতে যাইনি। তাই কোর্ট হাজতের বারান্দায় আমরা চারজন চারটি চেয়ারে বসে ভাবছিলাম, হয়তবা ভুল করে আমাদের ধরে এনেছে, এখুনি ছেড়ে দিবে। বিকালে গিয়ে ইজতেমার কাজ শুরু করব। হঠাৎ মাইকের আওয়ায, 'নওদাপাড়ায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর বার্ষিক 'তাবলীগী ইজতেমা' বাতিল করা হয়েছে'। মাইকের প্রতিটি আওয়ায আমার বুকে যেন শেল বিদ্ধ করছিল, অন্তরে চরম আঘাত হানছিল। হৃদয়কে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলছিল। সহ্য করতে না পেরে বললাম, 'ইজতেমা বন্ধ'? সালাফী ছাহেব উত্তর দিলেন 'ইজতেমা বন্ধ করার জন্যই তো আমাদের এখানে আনা হয়েছে'। আমীরে জামা'আত বললেন, 'চক্রান্ত আরও গভীরে'। বিষণ্ন বদনে ভাবনার চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে :

এমন সময় পুলিশের আহ্বান স্যার চলেন। কোথায়? বলল, স্যার চলেন। উঠলাম প্রিজন ভ্যানে। আমাদের সোজা নিয়ে গেল জেলখানায়। গেইটে ঢুকতেই জেলার ছাহেব হাযির। ডেপুটি জেলার মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ছাত্র এবং সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে বাড়ী। বলা হ'ল, একটু ভাল জায়গায় ব্যবস্থা করো। খাতায় নাম-ঠিকানা লেখা, সই-স্বাক্ষর করার পর জেল পুলিশ ও একজন পুরাতন কয়েদীর (ম্যাট) হাতে আমাদের তুলে দিয়ে বলা হ'ল, ৬ সেলের ৪নং কক্ষ। ম্যাট সোহরাব কিছুটা ইতস্তত করছিল। কারণ পরে বুঝলাম যে, এটিই হ'ল রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের সবচাইতে নিকৃষ্ট সেল। এখানে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী বন্দীদের প্রথমে এনে রাখা হয়। আমরাও এখন জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধের চারদলীয় জোট সরকারের দৃষ্টিতে অনুরূপ দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আসামী। তাই আমাদের স্থান এখানেই হয়েছে। জানালা বিহীন পুরাতন জীর্ণ-শীর্ণ সংকীর্ণ এই সেলটির দরজা মোটা লোহার রড দিয়ে তৈরী। বাহিরে উঁচু দেওয়ালের উপরে কাঁটাতার দিয়ে মোড়ানো। যাতে কোন আসামী দেওয়াল টপকে বেরিয়ে যেতে না পারে। ভিতরে তিন

ফুট উঁচু দেওয়াল ঘেরা টয়লেট। বসলে মাথা দেখা যায়। একজন টয়লেটে গেলে অন্যদের পিছন ফিরে বসে থাকতে হয়। ১৯০৮ সালে তৈরী এই জরাজীর্ণ কক্ষে ঢুকিয়ে জনপ্রতি তিনটি করে পুরাতন কম্বল দিয়ে ম্যাট দরজায় তালা মেরে দিল। সাথে ১টি করে এ্যানামেলের উঁচু থালা ও বাটি দিল। যাওয়ার সময় সে বলল, 'স্যার একটি কম্বল দিয়ে বালিশ বানাবেন, একটি দিয়ে বিছানা ও একটি গায়ে দিবেন। স্যার চিন্তা করবেন না, জেলে না আসলে বড় হওয়া যায় না। আসি স্যার! সকালে দেখা হবে'।

ম্যাট চলে গেলে আমরা বিছানা ঠিক করতে লাগলাম। দেওয়ালের প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে। এত ছোট রুমে চার জন শোয়া কঠিন। শু'লে দেওয়ালে পা ঠেকে। সেই সাথে শুরু হ'ল মশক বাহিনীর হামলা। অগণিত মশার ভনভনানী ও ফাঁক পেলেই প্রচণ্ড কামড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। থালা দিয়ে আমি বাতাস করে মশার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। এভাবেই ফজরের আযান হ'ল।

দরসে কুরআন :

আমীরে জামা'আতের ইমামতিতে ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর তিনি এক হৃদয়গ্রাহী দরস পেশ করলেন। দরসটি ছিল সময়োপযোগী ও মন গলানো। আমার যতদূর মনে পড়ে 'তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না তোমরাই বিজয়ী। যদি তোমরা ঈমানদার হও' সূরা আলে ইমরান ১৩৯ আয়াতের উপরে তিনি দরস পেশ করেছিলেন। এ সময়ে তিনি বললেন, নূরুল ইসলাম! আমাদের আন্দোলন আল্লাহ কবুল করেছেন। নবী-রাসূলগণের ন্যায় আমাদের উপরও নির্যাতন নেমে এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন। তোমরা ভীত হয়োনা। সে যুগে যেমন নবীগণ প্রচলিত কোন মনগড়া বিধানের সঙ্গে আপোষ করেননি, আমরাও তেমনি সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষকে স্রেফ আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানিয়েছি। আমরা নেতাদের বলেছি 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। এর কারণে আমরা সকল দল ও মতের নেতাদের বিরাগভাজন হয়েছি। আমাদের পূর্বসূরী আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ জেল-যুলুমের সম্মুখীন হয়েছেন। বাতিলপন্থীদের হাতে অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করেছেন। ফাঁসিতে জীবন

দিয়েছেন। কিন্তু ঈমান হারাননি। আমাদের অবস্থাও অনুরূপ হ'তে পারে। অতএব তোমরা যেখানেই থাক না কেন, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলবে না এবং আল্লাহ্‌র উপরে তাওয়াক্কুল হারাবে না। আমাদের চারজনের কথা যেন একই রকম হয়। নূরুল ইসলাম! হয়তবা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। চার জনকে চার জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। ভয়-ভীতি দেখিয়ে বা নির্যাতন করে মিথ্যা কথা বলিয়ে নিতে চাইবে। খবরদার মরবে, কিন্তু ঈমান হারাবে না'।

ফাইলে হাযিরা :

কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন সকালে নবাগত বন্দীদের গণনার জন্য কেইস টেবিলের সামনে জমা করে হাযিরা করা হয়। সেখানে গিয়ে উপুড় হাঁটুতে লাইনে বসে থাকতে হয়। আমাদের জন্য এটা ছিল বড়ই হীনকর। আমীরে জামা'আত এক পাশে গাছের ধারে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাফী ছাহেব ও আমাকে পাঠালেন কারা কর্মকর্তার টেবিলে গিয়ে আমাদের নাম-ঠিকানা লিখিয়ে আসার জন্য। ভদ্রলোক আমাদের দ্রুত বিদায় করে দেন। পরে একজন কারারক্ষী বলল, আপনারা তো সহজে পার পেয়ে গেলেন। ইতিপূর্বে একবার ফজলে হোসেন বাদশা (বর্তমানে রাজশাহী সদর এম.পি. ২০০৯-১৬ইং) এলে তিনি লাইনে না বসায় জনৈক কারারক্ষী তাকে লাঠি দিয়ে মারে। পরে চিনতে পেরে উভয়ের মধ্যে মিটমাট করে দেওয়া হয়।

সালাফী ছাহেব আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। তাই পরের দিন তাকে কারা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হ'ল। আমরা তিনজন আরো একদিন ঐ কক্ষে থাকলাম। ২য় দিন সকালে বের হ'লে পাশের কক্ষের বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। দু'একজন বয়স্ক ছাড়া সবাই তরুণ। তাদেরকে খুব হাসি-খুশী দেখলাম। আযীযুল্লাহর সঙ্গে ওদের ভাব জমে গেল। ওরা খুশী মনে বলল, আমাদের কোন ভয় নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের সাহায্যে আছেন। পত্রিকার হৈ চৈ থামানোর জন্য আমাদের ৬৭ জনকে ধরে এনেছে। সত্বর মুক্তি পাব'। আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। জেএমবি হওয়া সত্ত্বেও এরা মুক্তি পাবে? হ্যাঁ। পরে যখন আমরা নওগাঁ জেলে, তখন জানতে পারলাম যে, এদের ৪০ জন একদিনে এবং তার দু'সপ্তাহ পরে বাকী ২৭ জন মুক্তি পেয়েছে। হ্যাঁ, একেই বলে আইওয়াশ।

তৃতীয় দিন শুক্রবার স্যারকে কারা হাসপাতালে নেওয়া হ'ল। থাকলাম আমি এবং আযীযুল্লাহ। এ দিন ম্যাট সোহরাব এসে সালাম দিয়ে আমাদের হাতে একটি করে টিকেট (মামলার তালিকা) ধরিয়ে দিল। অতঃপর আমাদের দু'জনকে এক সাথে না রেখে আযীযুল্লাহকে পাশের রুমে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

রাজশাহী থেকে গোপালগঞ্জ কারাগারে :

৪র্থ দিন ২৬শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সকালে নাশতা শেষ না হ'তেই বাবু এসে সালাম দিল। অতঃপর ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে তার সাথে দরবার হলে গিয়ে হাযির হলাম। দেখলাম সেখানে সালাফী ছাহেব ও আযীযুল্লাহকে ডাণ্ডাবেড়ী পরানো হচ্ছে। আমাকে দেখে সালাফী ছাহেবের চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরে পড়ল। আমিও চোখের পানি রুখতে পারলাম না। এসময় আমাকেও ডাণ্ডাবেড়ী পরানো হ'ল। সোহরাব ম্যাট সান্ত্বনা দিয়ে বলল, স্যার ধৈর্য ধারণ করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব অভ্যাস হয়ে যাবে।

তারপর আমাদের তিন জনকে একদল পুলিশ মাইক্রোতে উঠিয়ে নিয়ে রওনা হ'ল। কোথায়, কেন? কিছুই বুঝতে পারছি না। মাইক্রো দ্রুতগতিতে নাটোর হয়ে কুষ্টিয়ার পথ ধরল। তখন আমাদের দায়িত্বশীল এসকর্ট দারোগাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কোথায় যাচ্ছি? তিনি বললেন, গোপালগঞ্জ কারাগারে। আগামীকাল সেখানে আপনাদের বিরুদ্ধে কোটালীপাড়া ব্রাক অফিসে ডাকাতি মামলার হাযিরা আছে।

অফিসার শাহ আলম অত্যন্ত ভদ্রলোক। তিনি বুঝতে পারছেন, আমরা ভয় পাচ্ছি। তাই আমাদের স্বাভাবিক করার জন্য টুকিটাকি প্রশ্ন ও আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। প্রথম প্রশ্ন : বলুন তো ছালাত শেষে আপনারা দলবদ্ধ মোনাজাত করেন না কেন? সালাফী ছাহেব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। তাতে তিনি খুবই খুশী হ'লেন। ছালাতের পার্থক্যমূলক সমস্ত কথাগুলোই আলোচনা হ'ল। তারপর রাজনীতি, অর্থনীতি, সঊদী আরবের সাথে আমাদের কতটা মিল ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি কৌশলে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়ে গেলেন। কথায় কথায় সফরটা ভালই হ'ল। গোপালগঞ্জ জেলখানায় পৌঁছতে রাত ৮-টা বেজে গেল। তার আগে থানায় নিয়ে আমাদের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা সারা হয়।

জেলখানায় পৌঁছলে জেলার সালাফী ছাহেবকে বললেন, হুযুর আপনারা পরিস্থিতির শিকার। দুঃখ করবেন না। আমি আপনাদের জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। আপনাদের কোথায় যে থাকতে দেই? এখানে মাত্র ২০০ জন বন্দীর থাকার জায়গা আছে। কিন্তু আছে এখন ৪৫০ জন। তারপর তিনি নিয়ে গেলেন 'আমদানী' ওয়ার্ডে। এটি ছিল সেমি পাকা ৪টি টিনশেড কক্ষের অন্যতম। গিয়ে দেখি একদল ঘুমিয়ে আছে, আরেকদল দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছে। ৪ ঘণ্টা পরে ঘুমন্তদের দাঁড় করিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের ঘুমানোর জায়গা করে দিবে। এভাবে ঐ জেলখানায় রাত্রি যাপন করতে হয়। এখানে আবার আমরা তিনজন গিয়ে হাযির। জেলার আসামীদের ম্যাটকে ডেকে বললেন, এঁরা বিশিষ্ট ভদ্রলোক। একটু ব্যবস্থা করে দাও। ম্যাট দু'জনকে তুলে দিয়ে আমাদের বসার জায়গা করে দিল। আমরা কোন মতে বসলাম। কিন্তু খাবার কোথায়? জেলখানায় খাবার শেষ হয় বিকাল ৪-টায়। আর এখন রাত ৮-টা। একজন কয়েদী তার ব্যাগ থেকে দু'মুঠো চিড়া বের করে আমাদের দিয়ে বলল, চিবিয়ে পানি খেয়ে রাত কাটান। সকালে ব্যবস্থা হবে। আমি ও আযীযুল্লাহ খেতে আরম্ভ করলাম। সালাফী ছাহেব গামছার গাঁট থেকে এক টুকরা রুটি বের করে গালে দেওয়ার আগে বললেন, ঐ যে রাজশাহীতে সকালের নাশতা একটি রুটি চার ভাগ করে তিন ভাগ খেয়েছিলাম আর এক ভাগ রেখেছিলাম নিদানকালের জন্য। সেই সকালের এক টুকরা শুকনো রুটি সালাফী ছাহেব মড়মড় করে সামনের দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছিলেন। আর আমি কবিতা আবৃত্তি করছিলাম-

শুকনো রুটিরে সম্বল করে
যে ঈমান আর যে প্রাণের জোরে
ঘুরিছে জগৎ মন্থন করে
সে শক্তি আজ ফিরিয়ে আন।
আমাদের হাতেই উড়িবে দেশে
তাওহীদের ঐ জয় নিশান।

সালাফী ছাহেব শত দুঃখের মধ্যেও হেসে বললেন, আল্লাহ কবুল করুন-আমীন!

অতঃপর বসে ঢুলতে ঢুলতে ফজরের আযান কানে ভেসে এল ১৬ ফুট উঁচু প্রাচীরের বাধা পেরিয়ে। জায়গার সংকীর্ণতার কারণে একজন একজন করে ছালাত শেষ করলাম। পরের দিন আমাদের গোপালগঞ্জ আদালতে হাযির করার কথা। কিন্তু তা না করেই আমাদের নামে ১০ দিনের রিম্যাণ্ড মনযূর করা হয়। যা পরে আমরা জানতে পারি।

গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় জেআইসি রিম্যাণ্ডে :

পরের দিন ২৭শে ফেব্রুয়ারী রবিবার সকালে লকআপ খোলা হ'লে আমাদের হাতে একটা করে গরম রুটি দিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলা হয়। অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের নিয়ে মাইক্রো রওয়ানা হয়। কোথায়, কে জানে? কোর্টে হাযির করা হ'ল না। অতঃপর কিছু দূর যেতেই ফেরিঘাট। বুঝতে পারলাম ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফেরি পার হয়েই কালো কাপড় দিয়ে আমাদের চোখ বাঁধা হ'ল। আতংকে শরীর শিউরে উঠল। ভাবলাম, হয়তবা এক এক করে ফাঁকা রাস্তার ধারে নামিয়ে ক্রস ফায়ারে দিবে। তিন জনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। মনে মনে দো'আ ইউনুস পড়তে লাগলাম। কিন্তু না! মানুষের কোলাহল ও যানবাহনের শব্দ বেড়েই চলল। এক পর্যায়ে মাইক্রোর গতি কমে এল। আমাদের নামতে বলা হ'ল। একটা বড় বিল্ডিং। আমাদেরকে হাত ধরে তিন তলায় উঠানো হ'ল। এবার চোখ খুলে দেওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম, এটা আমাদের জেআইসি রিম্যাণ্ড।

ক্যান্টনমেন্ট থানা হাজতে :

প্রথম দিন নাম, ঠিকানা ও পরিচয় ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত রিম্যাণ্ড শেষে বাদ মাগরিব ক্যান্টনমেন্ট থানা হাজতে নেওয়া হয়। অতঃপর থানা অফিসের আনুষ্ঠানিকতা সেরে আমাদের নেওয়া হ'ল একটা কক্ষে। সেখানে গোছগাছ শেষে আমরা শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ পাশের কক্ষের দরজার গ্রিল থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠের আওয়ায এল, *লা তাহযান। ইন্নাল্লা-হা মা'আনা*। দু'তিন বার একই আওয়ায শুনে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, পাশের কক্ষেই আছেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। আনন্দে মনটা নেচে উঠল। এই ভেবে যে, স্যার বেঁচে আছেন। তাঁকে মেরে ফেলেনি। *আলহামদুলিল্লাহ*। বারান্দায় কড়া পুলিশ প্রহরা। তাই বাংলায় কোন কথা বলার সুযোগ নেই। ফলে আমীরে

জামা‘আত কুরআনী আয়াতের মাধ্যমে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, আমি ভালো আছি। দুশ্চিন্তা করো না। তোমরাও ভয় পেয়ো না।

পরের দিন স্যারের এসকর্ট দারোগার মাধ্যমে আমাদের এসকর্ট দারোগা জানতে পারেন যে, একই দিন স্যারকে রাজশাহী কারাগার থেকে বিকেলে বের করে রাতে বগুড়া কারাগারে এনে রাখা হয়। পরদিন সকালে তাঁকে বগুড়া থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানায় আনা হয়। আমাদের পূর্বেই তাঁকে পাশের বড় কক্ষে একাকী রাখা হয়।

শুনলাম, স্যার ধূলাভরা মেঝের উপর পরনের পোষাক পরে শুয়েছেন। হাতের ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুতে চাইলেও তাঁকে সেটা দেওয়া হয়নি। গামছাটাও নিতে দেওয়া হয়নি। কারণ এটা নাকি আইনে নিষেধ আছে। কেননা অনেকে গামছা গলায় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। হাজত কক্ষের এক কোণায় পড়ে থাকা একটি ছেঁড়া খাকি কাপড়ের টুকরা কুড়িয়ে এনে তিনি মুষ্টি করে মাথার বালিশ বানান। এভাবেই তাঁকে রাত কাটাতে হয় দুর্গন্ধ ও মশার কামড়ের মধ্যে। কক্ষের মধ্যেই খোলা টয়লেট। আমাদের সঙ্গে বড় চাদর ছিল। তাই বিছিয়ে শুয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিন অবশ্য একটি ছেঁড়া কাঁথা ও কভারবিহীন ময়লা বালিশ তাঁকে এনে দেওয়া হয়। সেদিন রিম্যাণ্ড থেকে এসে দেখেন ঐ ছেঁড়া কাঁথার উপরেই বিড়ালের নরম পায়খানা ভরা। একজন পুলিশ ভদ্রতা দেখিয়ে সেটি ফেলে দেয় ও কাঁথাটি ধুয়ে শুকিয়ে দেয়। আরেকজন পুলিশ দয়াপরবশে রাতে একটা কয়েল ধরিয়ে দিয়ে যায়। ঐ ছেঁড়া কাঁথা ও ছেঁড়া বালিশে শুয়ে স্যারের মনের মধ্যে আপনা থেকেই উদয় হয়, যদি কখনো দাম্ভিক প্রধানমন্ত্রীর এই অবস্থা হয়, তখন তিনি বুঝবেন হাজতীদের বেদনা। হ্যাঁ। সেদিনের প্রধানমন্ত্রী পরে নিজেকে ও নিজের দুই ছেলেকে দিয়ে হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করেছেন। এটাই আল্লাহ্‌র বিচার!

উল্লেখ্য যে, দু’টির অধিক ফৌজদারী মামলা থাকলে সেইসব বন্দীর পায়ে বেড়ী পরানো হয়। বিশেষ করে কারাগারের বাইরে নেওয়ার সময়। আমাদের ৭টি করে মামলা এবং স্যারের ১০টি মামলা ছিল বিভিন্ন যেলায়। আমাদের ডাণ্ডাবেড়ী পরানো হ’লেও স্যারের পরানো হয়নি। অতঃপর জেআইসিতে স্যারের ধমকের পর আমাদের বেড়ী খুলে দেওয়া হয়। পরে সাড়ে ১৬ মাসের

কারা জীবনে স্যারের কেস পার্টনার হওয়ার সম্মানে আমাদের আর ডাণ্ডাবেড়ী পরানো হয়নি। *আলহামদুলিল্লাহ*। আল্লাহ আমাদেরকে জেলখানার এই কঠিন কষ্ট থেকে বাঁচিয়েছেন।

জেআইসি চেয়ার :

পরদিন সকাল ৯-টার আগে আমাদের বের করা হ'ল। অতঃপর মাইক্রোতে উঠিয়ে চোখ বেঁধে নতুন গন্তব্যে নেওয়া হ'ল। অনেকক্ষণ পর মাইক্রো থামলে আমাদেরকে সিঁড়ি বেয়ে অনেক উপরে একটি কক্ষে নিয়ে চোখ খুলে দেওয়া হ'ল। কক্ষের ভিতর একটি লম্বা টেবিল, কয়েকটি চেয়ার। চতুর্দিকে শাস্তি দেওয়ার নানা রকম কলা-কৌশল দেওয়াল ঘেঁষে টাঙ্গানো আছে। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানার এসকর্ট দারোগা আমার পাশে বসে আমাকে শাস্তি দেওয়ার নানান ধরনের যন্ত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। একটি স্টিলের সাদা চেয়ার, দাম ৯ লাখ টাকা। তৈরী আমেরিকায়। পরে শুনেছি স্যারকে যে চেয়ারে বসানো হয়েছিল, তা ছিল ১৩ লাখ টাকা দামের আরও নির্যাতনকারী চেয়ার। ঐ চেয়ারে বন্দীকে বসিয়ে হাত, পা চেয়ারের সাথে শক্ত করে বেঁধে বিদ্যুতের সুইচ টিপলেই সমস্ত দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চালন হ'তে থাকবে। চরম ঝাঁকুনী হ'তে থাকবে। কষ্টে নাক-মুখ দিয়ে ফেনা বের হবে। তখন সে সত্য কথা বলতে বাধ্য হবে।

একটি ব্লাক বোর্ডে ছোট ছোট পিন আটকানো আছে। বন্দীর হাত, পা ও দেহ ভালভাবে ব্লাক বোর্ডের সাথে বেঁধে বোর্ডটিতে সুইচ টিপে দিলে তা চরকির মত ঘুরতে থাকবে। তার সাথে সাথে মানুষটিও ঘুরতে থাকবে। একবার মাথা নীচে পা উপরে, আবার পা নীচে মাথা উপরে উঠতে থাকবে। এতে প্রস্রাব-পায়খানা হয়ে যাবে। ফলে সে সত্য কথা বলতে বাধ্য হবে। এভাবে হরেক রকম যন্ত্রের সাথে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন। এটি ছিল সরকারের ভাড়া করা একটি বিল্ডিং-এর তৃতীয় তলা।

'সত্যের তেজ' :

হঠাৎ এ সময় আমাদের এসকর্ট দারোগা আমাদের বললেন, দ্বিতীয় তলায় আপনাদের আমীর ছাহেবকে আনা হয়েছে। তিনি শুনতে পেয়েছেন যে, আপনাদের পায়ে বেড়ী পরানো হয়েছে। তাতে তিনি সিংহের মত গর্জে উঠে

বলেছেন যে, আমার নায়েবে আমীরের পায়ে বেড়ী! আর আমি আপনাদের সাথে কথা বলব? অসম্ভব, বেড়ী খুলে দিন'। তাঁর হুমকিতে জেআইসিতে উপস্থিত ২৩ জন দেশসেরা অফিসার চমকে গিয়েছেন। তারা সাথে সাথে আপনাদের বেড়ী খুলে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

বেড়ী খোলা হ'ল :

আমরা বসে আছি। আর ভাবছি কখন কোন শাস্তির হুকুম হয়। কিন্তু না। দেখলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা কারাগার থেকে বেড়ী খোলার চাবি এনে আমাদের বেড়ী খুলে দেওয়া হ'ল। পুলিশ অফিসাররা পরস্পরে বলতে লাগল, **একেই বলে 'সত্যের তেজ'!** এখানে যতবড় বাঘ আসুক না কেন, এই চেয়ারে বসলেই ভয়ে বিড়াল বনে যায়। অথচ ইনি দেখছি, এখানে এসে সিংহ হয়ে গেলেন। এরূপ সাহসী মানুষ আমাদের জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

জেআইসি রিম্যাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদ :

এসকর্ট দারোগা শাহ আলম আমার জীবন বৃত্তান্ত লিখছেন। এমন সময় দরজায় করাঘাত শুনে আমাকে তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়াতে বললেন। ১৫/২০ জন লোকের একটা দল এল। ঘরে ঢুকেই তারা বললেন, বসুন! বলেই একজন চোখ বেঁধে আমাকে হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল। আমি চেয়ারে বসে ভয়ে দো'আ ইউনুস পড়তে লাগলাম। জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের ইজতেমায় কত লোক হয়? বললাম লক্ষাধিক। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কি? বললাম, প্যাণ্ডেলেই। গালিব স্যার তো বললেন, দুই/তিন লক্ষ। তিনি কি তাহ'লে মিথ্যা বললেন? বললাম, স্যার দুই/তিন লক্ষ বলেননি, আমার বিশ্বাস। বললেন, আপনাদের মাসিক আয় কত? টাকা কোথায় পান? বললাম, ত্রিশটি যেলায় আমাদের কাজ হয়। কোন যেলা থেকে তিন শত, কোন যেলা থেকে পাঁচশত টাকা হারে এয়ানত আদায় হয়। তাছাড়া যাকাত, ফেৎরা, ওশর ইত্যাদি থেকে প্রায় ১ লাখের মত আয় হয়। নিট হিসাব অফিস সহকারী জানেন। বললেন, আমরা মোফাক্ষার ছাহেবকে ধরে এনেছি। তিনি তো বললেন, মাসে প্রায় দশ লক্ষ টাকা আয় হয়। বিভিন্ন যেলা সভাপতিদের বেতন দেওয়া হয়। লোকদের দান করার জন্য আমীরে জামা'আতকে মাসে এক লাখ করে টাকা দেওয়া হয়। আমি বললাম, এসব

ভুল কথা। আমীরে জামা'আতকে আমরা কিছুই দেইনা। তাছাড়া আমাদের সহ যেলা সভাপতিদের কাউকে বেতন দেওয়া হয় না। আমাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব, রসিদ ও ভাউচার সবই ক্যাশ বইতে লিপিবদ্ধ আছে। তা দেখলে সঠিক হিসাব জানা যাবে। মৌখিক কথা ভুল হ'তে পারে। এভাবে তারা আমাদেরকে যা প্রশ্ন করে দোতলায় গিয়ে একই প্রশ্ন আমীর ছাহেবকে করে। উনাকে যেসব প্রশ্ন করা হয়, তা পুনরায় এসে আমাদেরকে বলা হয়। কথা একই হওয়াতে তারা নিশ্চিত হয় যে, তারা যা ভেবেছিল, তা ঠিক নয়।

একজন প্রশ্ন করলেন আচ্ছা আপনারা ছালাত আদায় করেন তো হাত উঁচু করেন কেন? আবার আমীনও জোরে বলেন? আমি উত্তর দিচ্ছি এমন সময় একজন বললেন, চলেন স্যারের কাছে যাই। এই বলে সবাই আমার কাছ থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সেখান থেকে ফিরে এসে জনৈক পুলিশ আমাদের বলল, দ্বিতীয় তলায় গিয়ে দারুন ব্যাপার দেখলাম। আমীর স্যারকে ছালাতের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বুখারী-মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদীছের নম্বর সহ বলতে লাগলেন। অফিসাররা স্যারের মুখ থেকে শুনে পাশের কক্ষে রাখা বঙ্গানুবাদ হাদীছের সাথে মিলিয়ে দেখেন সব ঠিক আছে। তখন বারিধারা জামে মসজিদ থেকে আনা তাদের জনৈক আলেমকে বলল, আমাদের ছালাত কোন হাদীছে আছে? আলেম তা বলতে পারল না। তখন তারা বলল, বুখারী-মুসলিমে নেই তাহ'লে কোন হাদীছে আছে? পুলিশটি বলল, আমি ওদের কথা শুনে যারপর নেই খুশী হ'লাম। তারপর আস্তে করে বলল, স্যার! আমি কিন্তু 'আহলেহাদীছ'। ভয় করবেন না, সত্যের জয় হবেই। এভাবে ১ম দিনের রিম্যাণ্ড শেষে ক্যান্টনমেন্ট থানা হাজতে ফিরিয়ে আনা হ'ল। পরে জানলাম, ঐ আলেমকে আনা হয়েছিল স্যারের বাসা থেকে আনা ডায়েরী সমূহে আরবী ও উর্দূতে লেখা কিছু কিছু উদ্ধৃতির অর্থ বুঝার জন্য। কিন্তু ঐ আলেম তা পড়তে পারেনি। ফলে তা অবশেষে স্যারের কাছেই নেওয়া হয়। তখন তিনি নিজেই ওগুলো বুঝিয়ে দেন। তাতে সবাই মুগ্ধ হয়।

ভক্ত পুলিশের কাণ্ড :

ভয় ও শংকার মাঝে সারাদিনের রিম্যাণ্ড শেষে ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে থানায় ফিরে খানা শেষে সন্ধ্যার কিছু পরেই ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত ১-টার ঘণ্টা বাজার

শব্দ কানে আসল। চোখ খুলে দেখি দরজার কাছে একজন পুলিশ ফিস ফিস করে কান্নার স্বরে বলছে, স্যার! রেডি হৌন, আমি সব ব্যবস্থা করেছি। স্যার! আপনাদের পালিয়ে যেতে হবে। এখানে বহু লোককে ধরে এনে ক্রস ফায়ারে দেয়। স্যার আমার ভয় হচ্ছে। তাই আমি মাইক্রো রেডি করেছি। গেটের চাবি ম্যানেজ করেছি। আপনাদের এখান থেকে বের করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। স্যার! দেরি করবেন না, তাড়াতাড়ি করুন'। আমি বললাম, আমরা পালালে তোমার কি অবস্থা হবে? চাকরী যাবে, জেল-জরিমানা হবে, জীবনও চলে যেতে পারে। তখন মিনতির স্বরে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে সে বলল, স্যার আমি পরিণাম বুঝেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, একটি জীবনের বিনিময়ে যদি চারটি জীবন মুক্ত হয়, একটি প্রাণের বিনিময়ে যদি আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ আলেমদের প্রাণ বেঁচে যায়, তবে সেটাই হবে আমার পরকালে মুক্তির অসীলা। স্যার! দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি করুন'। আমি তাকে খুবই বুঝানোর চেষ্টা করলাম যে, দেখ আমরা এমন ব্যক্তি বাংলাদেশে আমাদের লুকানোর কোন জায়গা নেই। যেখানে যে গ্রামে যাব, সবাই চিনে ফেলবে। তুমি যাও আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ কর'। কিন্তু সে নাছোড় বান্দা। বলল, স্যার! আমি সব ব্যবস্থা করেছি, ঢাকাতেই থাকবেন। দুই/চার বছর থাকলেও কেউ চিনতে পারবে না, কোন অসুবিধাও হবে না। স্যার! আপনাদের বাঁচানো আমার ঈমানী দায়িত্ব। আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেজন্য তিনি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছেন। এখন নবী-রাসূল নেই, আপনারা *ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া*। আপনারাই বাংলাদেশে রাসূলের ছহীহ হাদীছ প্রচার ও প্রসারের কাজ করেন। তাই আপনাদের বাঁচিয়ে, পরকালে বাঁচার চেষ্টা করা আমাদের দায়িত্ব। স্যার! তালা খুলছি বেরিয়ে আসেন। ওনাদেরও ডাকেন। বললাম, না, আমরা লুকাব না। তুমি দো'আ করো, কোন ক্ষতি হবে না *ইনশাআল্লাহ*। ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। পরে জানলাম, একই কথা সে পাশের কক্ষে স্যারের কাছে গিয়েও বলেছে। কিন্তু তিনি কড়া ভাষায় না করে দিয়েছেন।

পরের দিন সকালে আবার যৌথ জিজ্ঞাসাবাদ সেলে গিয়ে দেখি সবার চেহারায় উৎফুল্ল ভাব। তারা যেন নতুন কিছু পেয়েছে। বহু আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সমূহ জানতে মহা ব্যস্ত সবাই। আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা। এভাবে আমাদের দশ দিনের জেআইসি রিম্যাণ্ড শেষ হ'ল।

পুনরায় গোপালগঞ্জ কারাগারে :

রিম্যাণ্ড শেষে ০৮.০৩.২০০৫ইং তারিখে আমাদেরকে পুনরায় গোপালগঞ্জ কারাগারে ফিরিয়ে আনা হ'ল। উল্লেখ্য যে, অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণে সালাফী ছাহেবকে প্রথম ৫দিনের রিম্যাণ্ড শেষে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রিম্যাণ্ডের শেষ দিন ক্যান্টনমেন্ট থানায় আনা হয়। অতঃপর আমাদেরকে এক সাথে গোপালগঞ্জ কারাগারে ফেরৎ নেওয়া হয়। অতঃপর জেলখানায় ঢুকতেই কয়েদী হযরত আলী সালাম দিয়ে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নির্দিষ্ট কক্ষে নিয়ে গেল। হযরত আলী জেলখানায় তখন ম্যাটের দায়িত্ব পালন করছে। উঁচু বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ। গলায় ঝুলছে চাঁদির তৈরী বিরাট এক তাবীয। শক্ত কালো সুতা দিয়ে বাঁধা। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। দেখে জাল্লাদের মত মনে হয়। সে সবাইকে বলে দিল যেন আমাদের সাথে সুন্দর আচরণ করে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? অধিকাংশ কয়েদীর মুখে বিড়ি। গন্ধে বমি হওয়ার উপক্রম। সালাফী ছাহেব কিছুক্ষণ চুপ থেকে কয়েদীদের উদ্দেশ্যে ধূমপানের অপকারিতা সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের আলোকে বক্তব্য রাখলেন। গভীর আগ্রহে আলোচনা শুনে সবাই মুগ্ধ। তারপর আমার কথা শেষ না হ'তেই হযরত আলী ঘোষণা দিল এখন থেকেই আমরা এই হারাম খাদ্য পরিহার করলাম। বলার সাথে সাথেই যার কাছে যত বিড়ি ছিল সব ফেলতে লাগল। তাদের বিড়ি ফেলা দেখে মদ হারাম হওয়ার ঘোষণায় মদীনায় ছাহাবীদের মদের মটকা ভেঙ্গে ফেলার দৃশ্য মনে পড়ে গেল।

মাগরিবের ছালাতের সময় হয়ে গেল। আযান দিবে কে? হযরত আলী সুললিত কণ্ঠে আযান দিল। সালাফী ছাহেবের ইমামতিতে ঘরে অবস্থানরত কিছু হিন্দু বাদে সবাই ছালাতে দাঁড়িয়ে গেল। সবাই যেন এক শান্তির আলো ফিরে পেল। জেলার মন্তব্য করলেন, স্যার! আমি তিন বছর ধরে এখানে আছি। এত সুন্দর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কখনও দেখিনি। লাঠিপেটা করেও ওদের মুখ বন্ধ করা যায় না। আর আপনারা কি যাদুর কাঠি মুখে ছোঁয়ালেন, ওরা সব বোবা হয়ে গেল? আমাকে এক হিন্দু কয়েদী ফিস ফিস করে বলল, আপনারা কে? বাড়ী-ঘর কোথায়? আমি বললাম, কেন? আমাদের হিন্দুরা সব বলাবলি করছে, উনারা স্বর্গের দেবতা। নইলে যে বিড়ি ছাড়া এক দণ্ড থাকা যায় না, সেই বিড়ি আজ তিন দিন খাই না! একবার মনেও পড়ছে না।

ওনাদের মুখের কথায় এত আছর, এত প্রভাব? নিশ্চয়ই উনারা মহামানব। বললাম, আমরা দেবতাও নই, মহামানবও নই। আমরা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সদস্য। উনি নায়েবে আমীর। নাম আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বাড়ী রাজশাহীতে। আমি ঐ দলের সেক্রেটারী, নাম নূরুল ইসলাম, বাড়ী মেহেরপুরে। আরেক জনের নাম আযীযুল্লাহ, বাড়ী সাতক্ষীরায়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক।

স্যার! আপনাদের দল খুব ভাল। আপনাদের কারণে সবাই শান্ত আছে। নইলে হৈ হুল্লোড়, গণ্ডগোল, চিৎকার-চেঁচামেচিতে সব সময় জেলখানা গরম হয়ে থাকে। অথচ এখন কোন কথা নেই, সবাই শান্ত। স্যার! আপনারা অচিরেই মুক্তি পাবেন।

ফরিদপুর কারা হাসপাতালে :

সালাফী ছাহেব অসুস্থ হওয়ার কারণে পরদিন তাঁকে একাকী কোর্টে নেওয়া হয়। অতঃপর সেখান থেকে অনুমতি নিয়ে চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর কারা হাসপাতালে পাঠানো হয়। কারাগারে ৬দিন থাকার পর ১৪.০৩.২০০৫ইং তারিখে নওগাঁ কারাগারে যাওয়ার পথে সালাফী ছাহেবকে নেওয়ার জন্য আমাদের গাড়ী ফরিদপুর কারাগারে যায়। সেখানে গিয়ে এক আজব দৃশ্য দেখলাম। কিছু কয়েদীর দু'পায়ে এমন বেড়ী পরানো, যাতে হাঁটতে গেলে পা বেশী লম্বা করা যায় না। অর্থাৎ দৌঁড়ানোর কোন উপায় নেই। অথচ আমাদের পায়ে বেড়ী থাকা সত্ত্বেও লম্বা ধাপ ফেলা যায়।

নওগাঁ যেলা কারাগারে :

গোপালগঞ্জ থেকে ৭ম দিন ১৪ই মার্চ'০৫ সোমবার সকালে আমাদেরকে নওগাঁ কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। নওগাঁ যাওয়ার দু'টি রাস্তা। নাটোর-বগুড়া হয়ে নওগাঁ অথবা নাটোর-রাজশাহী হয়ে নওগাঁ। এসকর্ট দারোগা আমাদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। আমি রাজশাহী হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলাম। কারণ বেশ কিছুদিন হ'ল 'দারুল ইমারত' দেখিনি। যাওয়ার পথে যদি এক নযর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অফিস, নওদাপাড়া মাদরাসা ও আশপাশের অবস্থা কিছুটা হ'লেও দেখতে পাই। যদি পরিচিত কারো চোখে চোখ পড়ে ইত্যাদি আকাঙ্ক্ষা নিয়েই ঐ পরামর্শ দিলাম। রাতে কাগজ-কলম জোগাড় করে

আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে একটি চিঠি লিখলাম। ভাবলাম, যদি রাজশাহী হয়ে যায়, তবে মারকাযের সামনের মহাসড়কে চিঠিটা ফেলে দেব। যাতে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে কেন্দ্র জানতে পারে। যেমন চিন্তা, তেমনি কাজ। মাইক্রো যখন আমচত্বরে আসলো তখন এক নযর 'দারুল ইমারত' দেখার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। মাইক্রোর কালো গ্লাস খুলে ব্যথাতুর আত্মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করলাম। ঐ ফাঁকে চিঠিটি ছুঁড়ে মারলাম, যাতে কারো নযরে পড়ে। পরে জানলাম, দায়িত্বশীল কেউ ওটা পায়নি।

বিকাল ৪-টায় আমরা নওগাঁ নতুন জেলখানায় পৌঁছলাম। অত্যন্ত সুন্দর পরিপাটি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। জেলখানার ভিতরে রাস্তার দু'পাশে নানা রকম ফুলের গাছ দিয়ে সাজানো। জেলার, সুবেদার, জমাদার সবাই আমাদের গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা মাইক্রো থেকে নামতেই তাঁরা এসে সালাম দিয়ে অফিসে বসালেন। অতঃপর আনুষ্ঠানিকতা সেরে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। দক্ষিণমুখী পাঁচ কক্ষ বিশিষ্ট নতুন সেলের সর্ব পশ্চিমের কক্ষে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হ'ল। আমরা তিন জন একই কক্ষে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম। নিজের মত করে বিছানা সাজিয়ে নিলাম।

আমীরে জামা'আতের নওগাঁ জেলখানায় আগমন :

২৫শে মার্চ'০৫ শুক্রবার ভোরের সোনালী সূর্য তার ডগমগে রূপ নিয়ে পূর্বাকাশে প্রভা ছড়াচ্ছে। ফজরের ছালাত শেষে আমরা বসে তাসবীহ-তাহলীল করছি। সাথী আযীযুল্লাহ মন খারাপ করে মাঝে-মধ্যে সকালে শুয়ে থাকত। সালাফী ছাহেব সর্বদা মজার মজার গল্প করতেন। একই গল্প বারবার শুনতাম। কিন্তু ওনার গল্পে কোন ভুল পেতাম না। সেদিনও গল্প করছেন। এমন সময় হঠাৎ লকআপ খোলার ঘণ্টা পড়ে গেল। ম্যাট এসে লকআপ খুলে দিয়ে কি যেন বলতে চাইল। কিন্তু পিছনে কারারক্ষী বাবুকে দেখে চুপ হয়ে গেল। কেমন জানি এক অব্যক্ত আনন্দের কথা তাদের চাহনিতে প্রকাশ পাচ্ছিল। সেল থেকে বের হয়েই দেখি আজকের আয়োজন ভিন্ন। সেলের গেইটে অতিরিক্ত রক্ষী পুলিশ। জেলখানার বেষ্টনীর ষোল ফুট উঁচু প্রাচীরের ভিতরে প্রতি একশ' ফুট অন্তর একজন করে কারারক্ষী পুলিশ নিয়োজিত থাকে। কিন্তু আজকে তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। প্রাচীরের বাইরে তিন তলা

বিল্ডিং-এর ছাদে রাইফেলধারী নিরাপত্তা বাহিনী নিযুক্ত। এত সব আয়োজন দেখে বুঝতে পারলাম আজকে কিছু একটা হবে। সূর্য যত ঊর্ধ্বাকাশে উঠছে, আমাদের সেলের প্রতি বিশেষ নযর ততই বাড়ছে। এক সময় ম্যাট কয়েকজন কয়েদীকে নিয়ে এসে আমাদের পাশের রুমটি ধুয়ে-মুছে ছাফ করল। ফ্যান টাঙানো হ'ল। মেইন গেইটের সাথে আমাদের দু'টি কক্ষের বিদ্যুৎ লাইনে সংযোগ দেওয়া হ'ল। জিজ্ঞেস করলাম, কেন এই তোড়-জোড়? উত্তর আসলো, জানি না। সুবেদার এসে চেক করে বললেন, পরিষ্কার হয়নি, দেওয়ালগুলি ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে দাও। আরেক দফা অভিযান চলল। ছাদে লেগে থাকা মাকড়সার কালো দাগগুলি সব পরিষ্কার করা হ'ল। ইতিমধ্যে জেলার ছাহেব এসে পরিদর্শন করে গেলেন। সুবেদারের কাছে কারণ জানতে চাইলে তিনি মুচকি হেসে জানার আগ্রহে আরও উত্তাপ ছড়ালেন।

আযীযুল্লাহ আঙ্গিনায় ঘুরছিল। হঠাৎ সে উৎফুল্লচিত্তে হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে এসে বলল, আমীরে জামা'আত আসছেন। সালাফী ছাহেব তখন বিছানায় শুয়েছিলেন। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে খুশীর খবর জানালাম। আনন্দে আপ্লুত হয়ে তিনি তিনবার *আলহামদুলিল্লাহ* বলে দ্রুত বাইরে আসলেন। আমরা তিনজন সেলের আঙ্গিনার গেইটে দাঁড়িয়ে আমীরে জামা'আতের প্রতীক্ষায় রইলাম। ইতিমধ্যে সমস্ত জেলখানায় তাঁর আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়েছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি ওয়ার্ডগুলির বারান্দায় ও গেইটে কয়েদীরা সব মেইন গেইটের দিকে আমীরে জামা'আতকে এক নযর দেখার জন্য উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সুবেদার দ্রুত এসে রুমটি পুনরায় চেক করে আমাদের খবর দিলেন আমীরে জামা'আত আসছেন। আমরা নিশ্চিত খবর পেয়ে আনন্দে রাস্তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম সুবেদার, জমাদার ও কিছু কয়েদী আমীরে জামা'আতকে সাথে নিয়ে আমাদের সেলের দিকে আসছেন। আশ-পাশের কয়েদীরা সালাম দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। আমাদের সেলের প্রবেশ পথে সালাফী ছাহেব দাঁড়িয়েছিলেন। দীর্ঘদিনের সাথী আমীরে জামা'আতকে কাছে পেয়ে তিনি হারানো মানিক ফিরে পাওয়ার আনন্দে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। প্রায় একমাস অনিশ্চিত এক জগতে নানা শংকার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে পথের দিশারী পাঞ্জেরীকে কাছে পেয়ে আনন্দে আমি আর

আযীযুল্লাহ বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।... সুবেদার ছাহেব সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে রুমে নিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। দীর্ঘ দিন পর একসাথে চারজন বসে খেলাম। রিম্যাণ্ডের স্মৃতিময় দিনগুলির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলাম। দিনটি যে আমাদের জন্য কত আনন্দের ছিল, সত্যিই তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে আমীরে জামা'আত একটা থলের মধ্য থেকে পুরানো একটা বেডশীট বের করে আমাকে বললেন, এটা আমার গোপালগঞ্জ কারাগারের সাথীদের উপহার। এটা বিছিয়ে দাও। তারপর থলির মধ্য থেকে চিড়া, বিস্কুটের প্যাকেট ও কেক বের করে বললেন, এগুলিও আমার চার দিনের বন্ধুদের উপহার। এগুলি তোমরা খাও।

উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আত ২য় দফা ১০ দিনের জেআইসি রিম্যাণ্ড শেষে ১৯শে মার্চ'০৫ ঢাকা থেকে গাইবান্ধা পুরাতন কারাগারে এসে পরদিন ২০শে মার্চ বিকেলে গাইবান্ধা থেকে রওয়ানা হয়ে দিবাগত রাত ১২-টা ২০ মিনিটে গোপালগঞ্জ কারাগারে পৌঁছেন। অতঃপর সেখানে চারদিন থাকার পর ২৫শে মার্চ দুপুরে নওগাঁ কারাগারে আসেন।

এদিন ছিল শুক্রবার। আমীরে জামা'আত আমাদের বললেন, জেল গেইটে নামার সাথে সাথে জেলার ছাহেবের সাথে দেখা। তিনি বললেন, স্যার এসেছেন। থাকবেন তো ১৫ দিন। ইনশাআল্লাহ কোন সমস্যা হবে না। পরক্ষণেই সুপার এলেন। কুশল বিনিময়ের পর বললেন, স্যার থাকবেন তো বেশীর বেশী ২৫ দিন। এখন আপনার নামে পত্রিকায় বড় বড় হেডিং হচ্ছে। কিন্তু যখন বের হবেন, তখন এক কোণে ছোট্ট করে একটু খবর দিবে। আপনার আসার সংবাদ ঢাকা থেকে আমাকে আগেই জানানো হয়েছিল। স্যার ভিতরে যান। রাতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। বলেই তারা উভয়ে বাইরে জুম'আ পড়তে গেলেন।

ডায়েট সমাচার :

অতঃপর খাওয়া-দাওয়ার সময় আযীযুল্লাহ বলল, স্যার কালকে 'ডায়েট'। স্যার বললেন, সেটা কি? আযীযুল্লাহ বলল, স্যার সপ্তাহে একদিন গরুর গোশত বা মাছ বা ডিম দেওয়া হয়। আর একেই বলা হয় 'ডায়েট'। কখনো

সিদ্ধ হাফ ডিম দেয়। যা পাওয়ার জন্য সব বন্দী উন্মুখ হয়ে থাকে। তাছাড়া কালকে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। তাই উন্নত মানের খাবার দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য যে, আযীযুল্লাহ কাজলা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' বিল্ডিংয়ে অবস্থানকালে সংগঠন থেকে বহিস্কৃত সেই নিকৃষ্ট ব্যক্তিটির ষড়যন্ত্রে ইতিপূর্বে রাজশাহী কারাগারে ১৭দিন ছিল। ফলে তার কিছুটা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল।

ম্যাট-পাহারা : কারা বিধি অনুযায়ী যারা সশ্রম সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী, তাদের অন্যতম প্রধান কাজ হ'ল কারাগারের বন্দীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা। তাদের জন্য তিন বেলার খাদ্য প্রস্তুত করা, সময় মত তা বন্দীদের মাঝে সরবরাহ করা, সকাল-সন্ধ্যা দরজা খোলা ও বন্ধ করা, কারাগারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, বন্দীদের কারা অভ্যন্তরে সুশৃঙ্খলভাবে রাখা ইত্যাদি।

ম্যাট আব্দুল জাব্বার বিহারী :

নওগাঁ জেলখানায় চৌকাতে কাজ করত আব্দুল জাব্বার বিহারী। আমরা আসার পর তাকে আমাদের ম্যাট হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সাত বছর বয়সে অভাবের তাড়নায় ভারতের বিহার প্রদেশ থেকে নদী পথে নৌকায় ভাসতে ভাসতে এসে নওগাঁ যেলার আত্রাই রেল ষ্টেশনে আশ্রয় নিয়েছিল। ধান উৎপাদনের এলাকা। মাঠে ধান কুড়িয়ে তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত সে। এভাবেই সে ধীরে ধীরে বড় হয়। সে মসজিদে ছালাত আদায় করতে যায়। একদিন সে এলাকার এক প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তির নযরে পড়ে যায়। তিনি তাকে বাড়ীতে নিয়ে যান। সেখানেই সে প্রতিপালিত হয়। মনিবের দোকান ছিল আত্রাই রেল ষ্টেশন বাজারে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বশতঃ বিরোধী দলের লোকেরা একদিন রাতে দোকানটি পুড়িয়ে দেয়। পরের দিন তারা আমার ও আমার মনিবের নামে মিথ্যা মামলা দেয়। পরে মনিব যামিনে মুক্তি পায়, কিন্তু আমি সাত বছরের জেলের ঘানি টানছি। যার এখনো পাঁচ বছর বাকী। অথচ ঘটনার দিন আমি সেখানে ছিলামই না। এভাবে আসামীই হ'ল বাদী। আর বাদী হ'ল আসামী। এটাই হ'ল বাংলাদেশের রাজনীতির লীলাখেলা। এক্ষণে তার মুখে কিছু কথা শুনা যাক।-

প্রশ্ন : আপনি আহলেহাদীছ হ'লেন কিভাবে?

উত্তর : আমি তো জন্ম থেকেই আহলেহাদীছ। ভারতের বিহার রাজ্যের কলমিতলা আমার জন্মস্থান। আব্বা বড় মসজিদের ইমাম। একবার মাযহাবীদের সাথে আব্বার বাহাছ হ'ল। প্রতিপক্ষের বড় বড় হুযূর বিরাট পাগড়ী-জুব্বা পরে মহিষের গাড়ী বোঝাই করে কিতাব নিয়ে হাযির হ'লেন। আব্বা তাদের সামনে ছোট্ট একটি ব্যাগে মাত্র তিনটি বই নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। বাহাছ আরম্ভ হ'ল। বিচারক ছিলেন হিন্দু জজ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের ধর্মের নাম কি? জবাব আসল, ইসলাম। জজ: আপনাদের ধর্মীয় কিতাব কি কি? উত্তর : পবিত্র কুরআন ও হাদীছ। জজ : আচ্ছা আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআন ও হাদীছগুলি ইংরেজীতে নাম লিখে আমার কাছে জমা দিন। আমার আব্বা লিখলেন, (১) দি হলি কুরআন (২) দি হাদীছ বুখারী শরীফ (৩) দি হাদীছ মুসলিম শরীফ।

প্রতিপক্ষ জমা দিল : (১) দি হেদায়া (২) দি শরহে বেকায়া (৩) দি কুদূরী (৪) দি বেহেশতী জেওর ইত্যাদি।

জজ : আপনাদের ধর্মীয় কিতাব জমা দিন। উত্তর : স্যার এইগুলিই তো ধর্মীয় কিতাব। জজ : আপনারা কিছুক্ষণ আগেই বললেন, ধর্মীয় কিতাবের নাম কুরআন ও হাদীছ। এসব তো বলেননি। কুরআন ও হাদীছ জমা দিন। উত্তর : স্যার এগুলিতো কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। জজ : আমি তো ব্যাখ্যা চাইনি, আমি মূল কিতাব চেয়েছি।

অতঃপর আব্বার দিকে তাকিয়ে জজ ছাহেব বললেন, আচ্ছা মাওলানা ছাহেব! আপনি আপনার মূল কিতাব কুরআন শরীফ থেকে 'আমীন' বলা দেখান। সঙ্গে সঙ্গে কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে সূরা ফাতেহা বের করে দেখালেন যে তার শেষে 'আমীন' লেখা আছে এবং উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে হবে তা দেখালেন বুখারী ও মুসলিম থেকে। জজ ছাহেব আব্বার পক্ষে রায় দিয়ে নিরাপত্তা প্রহরী দিয়ে আব্বাকে মসজিদে পৌঁছে দিলেন। তখন ঐ পাগড়ীধারী হুযূরগণ আব্বার উপরে ক্ষিপ্ত হ'ল। কিছু দিন পর কৌশলে দাওয়াত দিয়ে রসগোল্লার মধ্যে বিষ প্রয়োগ করে তারা আব্বাকে মেরে ফেলল।

প্রশ্ন : আপনি ড. গালিব স্যারকে চিনলেন কিভাবে?

উত্তর : জেলখানায় আসার আগে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। তবে তাঁর নামের সাথে পরিচিত ১৯৯৮ সাল থেকে। এক শুক্রবারে আমি নলডাঙ্গা হাটের মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করে বসে তাসবীহ-তাহলীল করছি। এমন সময় ইমামের সাথে মুছল্লীদের কিছুটা বাক-বিতণ্ডা শুনে এগিয়ে গেলাম। দেখি 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' নামক একটি বই হাতে নিয়ে ইমাম ছাহেব উচ্চৈঃস্বরে বলছেন, দেখুন এই বইটা কোন আজেবাজে লেখকের লেখা নয়। লেখক একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। তিনি আহলেহাদীছদের 'আমীর'। এতদিন আমাদের আমীর ছিল না। এখন আমাদের আমীর হয়েছেন। সুতরাং তাঁর কথা শুনতে হবে এবং মানতে হবে। এই বইয়ের নির্দেশ মোতাবেক আমি ছালাত শেষে দলবদ্ধ মোনাজাত করিনি। আমার ইমামতি থাক বা না থাক আমি হাদীছের বিপরীত আমল করতে পারব না। ইমাম ছাহেবের দৃঢ় মনোবল দেখে মনে হ'ল তার পিছনে শক্ত দলীল আছে। লোকজন চলে যাওয়ার পর আমি ইমাম ছাহেবের কাছে গিয়ে বইটি হাতে নিয়ে দেখি তার লেখক হ'লেন **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তাঁর একটি সংগঠন আছে, যার নাম 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। শাখারীপাড়ার মুযযাম্মেল মাওলানা তার সভাপতি ইত্যাদি শুনে গালিব স্যারের সাথে দেখা করার আগ্রহ হ'ল। কিন্তু পরের বাড়ী কাজ করার কারণে সময় হয়নি। তবে মনে বাসনা ছিল প্রবল। তাই জেলখানায় তাঁর খেদমত করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। শুনেছি তিনি নাকি বই লিখে সব দান করে দিয়েছেন। কোন মূল্য নেন না। সভা করে, ওয়ায করে টাকা নেন না। ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেইটের সামনে পাঁচ তলা বিল্ডিং করে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' নাম দিয়ে এক বিরাট ছাপাখানা তৈরী করেছেন। সেখান থেকে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বই ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

ড. গালিব স্যার রাজশাহীর নওদাপাড়াতে এক মাদরাসা করেছেন। সেখানে লেখা-পড়া শিখে বড় আলেম হওয়া যায়। ছাত্ররা ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করে। সেখানে একটি বড় ইয়াতীমখানাও আছে। ঐ মাদরাসায় লেখাপড়া শিখে ছাত্ররা বড় আলেম হওয়ার জন্য মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়।

এত বড় গুণী ব্যক্তির সাথে জেলখানায় আমার সাক্ষাৎ! এটা আমার জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

বিকালে আমরা শুরু থেকে ২৫শে মার্চ'০৫ পর্যন্ত ৩১ দিনের জমানো কাহিনী বর্ণনা শুরু করলাম। তার মধ্যে স্যারের ও আমাদের জেআইসি রিম্যাণ্ডের কিছু কাহিনী ইতিপূর্বে বলেছি। বাকী স্যারের কাছে শোনা কিছু কথা এখন বলছি।-

স্যারের কিছু স্মৃতি :

২৩শে ফেব্রুয়ারী'০৫ বুধবার বিকালে রাজশাহী কারাগারে প্রবেশ করার পর ৪র্থ দিন ২৬শে ফেব্রুয়ারী শনিবার বিকালে পৃথক পুলিশ ভ্যানে স্যারকে বগুড়া যেলা কারাগারে নেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে যে পুলিশ এসকর্ট ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন গাইবান্ধা সাঘাটার জনৈক আহলেহাদীছ পুলিশ। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন, স্যার আপনাদের বিরুদ্ধে সবকিছু ষড়যন্ত্রের মূলে হ'ল আমাদের এলাকার কুলাঙ্গার এক ব্যক্তি। আপনি আমাদের এলাকায় যেসব উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কাজ করেছেন তার তুলনা নেই। দেশ স্বাধীনের পর থেকে কোন এমপি, মন্ত্রী আপনার কাজের ধারে-কাছেও যেতে পারবে না। কিন্তু ঈর্ষাকাতর ঐ ব্যক্তি, যে আগে 'জামায়াত' করত। পরে সেখান থেকে বহিস্কৃত হয়ে আপনার সংগঠনে প্রবেশ করে। তারপর আপনার বিশ্বস্ত হয়ে বড় পদের অধিকারী হয়। আপনি বিশ্বাস করে তাকে দিয়ে আমাদের যেলায় বহু জনসেবামূলক কাজ করিয়েছেন। অথচ সে নিজেই সবকিছুর ক্রেডিট দাবী করে। সে কলেজের সামান্য বেতনের প্রভাষক হয়েও ইয়াতীমের টাকা মেরে বগুড়া শহরে ১০ শতক জমি কিনে চার কামরা বিশিষ্ট পাকা বাড়ী করেছে। তার মাধ্যমে আপনি বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, নীলফামারী, জয়পুরহাট, লালমনিরহাট সহ উত্তরবঙ্গের অনেকগুলি যেলায় বহু মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, ওযূখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, সাধারণ ও ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন, ইফতার, কুরবানী, বন্যাত্রাণ, শীতবস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি জনসেবামূলক বহু কাজ করেছেন। আমাদের শিমুলবাড়ী মাদরাসার দোতলা বিশাল বিল্ডিং করে দিয়েছেন। এছাড়া মাদরাসার জন্য ২৮ বিঘা জমি কিনে দিয়েছেন। এলাকার গরীব রোগীদের ফ্রি চিকিৎসার জন্য 'নূরা জাহিম হাসপাতাল' করেছেন। বন্যার সময় হাযার হাযার টাকা ও ত্রাণ সামগ্রী গরীবদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। অনেকের বাড়ী-ঘর করে দিয়েছেন। অথচ

সে বলে সবকিছু সে নিজেই করেছে। আমরা তাকে ভালভাবেই চিনি। অবশেষে তার দুর্নীতি আপনার নযরে আসে এবং আপনি তাকে সংগঠন থেকে বের করে দেন। এতে আমরা খুবই খুশী হয়েছি এবং আপনার সততার ব্যাপারে এলাকাবাসী নিশ্চিত হয়ে গেছে। ঐ ব্যক্তি এখন সরকারের সঙ্গে লাইন করে আপনাদের জেল খাটাচ্ছে'।

সন্ধ্যা ৭-টার পর স্যার বগুড়া কারাগারে প্রবেশ করেন এবং তাঁকে ১২১ বছরের পুরানা ১০×৬ ফুট জানালা ও ফ্যান বিহীন ফাঁসির সেলের উত্তর প্রান্তের ৫নং কক্ষে একাকী রাখা হয়। যার ফাটা সিমেন্টের মধ্যে পিঁপড়ার সারি। সে সময় শীতের মধ্যে তাঁকে স্রেফ একটি কম্বলের উপরে শুয়ে থাকতে দেখে কারারক্ষী এক পর্যায়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। আমীরে জামা'আত কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, স্যার আমার বাড়ী চাঁপাই নবাবগঞ্জের বারোরশিয়ায়। আমাদের গ্রামে আপনি দোতলা মসজিদ করে দিয়েছেন। গত বন্যার সময় ঐ মসজিদের দো'তলায় গ্রামের নারী-শিশুরা আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যায়। অথচ আজ আপনার আশ্রয় কারাগারে। এই শীতের মধ্যে আপনার একটি বালিশ-কাঁথাও নেই। মশার কামড়ে আপনি ঘুমাতে পারছেন না। অথচ আমার কিছুই করার নেই'। স্যার তাকে সান্ত্বনা দেন। তিন ঘণ্টা ডিউটি শেষে যাওয়ার সময় রক্ষীটি বলে যায়, স্যার! আমার ভাই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পি.এস। আমি তাকে বলব, যেন তিনি দ্রুত আপনাকে মুক্ত করে দেন'। বের হবার সময় সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, স্যার! আপনার জন্য আমি বুকের রক্ত দেব'। এরপর আর কোনদিন তার সাথে দেখা হয়নি। তবে তার কান্নার শব্দ যেন এখনও শুনতে পাই।

স্যারের ১ম জেআইসি রিম্যাণ্ড :

পরদিন ২৭.০২.০৫ইং রবিবার সকালে স্যারকে গাবতলী চকসাদু গ্রামে বোমা বিস্ফোরণ ও শাহজাহানপুর থানার লক্ষ্মীকোলা গ্রামে গানের প্যাণ্ডেলে বোমা হামলা ও একজনকে হত্যা মামলায় ১০ দিনের জেআইসি রিম্যাণ্ডে বগুড়া থেকে ঢাকায় নেওয়া হয়। এটা সহ সকল মামলায় স্যারের নাম পরে ঢুকানো হয়। এটাই ছিল স্যারের ১ম রিম্যাণ্ড। সেখানে আমাদের সঙ্গে অদৃশ্য সাক্ষাতের ও রিম্যাণ্ডের কিছু বিবরণ ইতিপূর্বে বলেছি। বাকী প্রধান ঘটনা হ'ল, স্যার দেখলেন যে, তাঁর লিখিত 'দাওয়াত ও জিহাদ' বইটি সামনে খুলে রাখা

হয়েছে। সেখানে বেশ কিছু স্থানে মার্কারী কলম দিয়ে চিহ্নিত করা। উদ্দেশ্য, স্যারকে জঙ্গী প্রমাণ করা। অতঃপর স্যার তাদেরকে জিহাদের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেন এবং বইয়ের শেষ দিকে 'জিহাদ' অধ্যায়টি ভালভাবে পড়তে বলেন। এরপর থেকে বাকী দিনগুলি বলতে গেলে অপ্রয়োজনীয় কথায় কেটেছে। অতঃপর রিম্যাণ্ড শেষে ০৮.০৩.২০০৫ইং মঙ্গলবার স্যারকে ঢাকা থেকে পুনরায় বগুড়া কারাগারে আনা হয়।

স্যার ১ম গাইবান্ধা পুরাতন কারাগারে :

বগুড়া কারাগার থেকে পরদিন ০৯.০৩.০৫ইং বুধবার বগুড়া যেলা আদালতে হাযিরা দিয়ে বিকালে গাইবান্ধা কারাগারে নেওয়া হয়। বিকেল ৫-টায় লকআপ-এর পর রাত সাড়ে ৭-টায় পৌঁছানোর কারণে স্যারকে সাধারণ একটি কারাকক্ষে রাখা হয়। যেখানে ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ কয়েদী ছিল। ফলে স্যারকে সারা রাত দাঁড়িয়ে কাটাতে হয়। অন্য কয়েদীরা কেউ চিৎ হয়ে, কেউ কাত হয়ে ঠাসাঠাসি করে কোন মতে শুয়ে ছিল। জেলখানার ভাষায় কাত হয়ে শুলে তাকে 'রুই ফাইল' চিৎ হয়ে শুলে তাকে 'কাতলা ফাইল' বলা হয়। ম্যাটদের চাহিদা মত টাকা দিতে না পারলে সেই হতভাগাদের সারারাত চার ঘণ্টা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রচণ্ড মশার কামড়। কয়েদীদের কেউ কেউ নিজেরা দাঁড়িয়ে স্যারকে শোওয়ার কথা বললেও স্যার তাদের কষ্ট দিতে চাননি। তিনি ইশারায় রুকূ-সিজদার মাধ্যমে সারা রাত ছালাতে ও তাসবীহ তেলাওয়াতে অতিবাহিত করেন। ফজরের আযানের পর কয়েদীরা উঠলে তিনি তাদেরকে সংক্ষিপ্ত দরসের মাধ্যমে ছবর ও ছালাতের উপদেশ দেন।

এ সময় তিনি তাদের কারু কারু জীবনের করুণ কাহিনী শুনে বিগলিত হন। যেমন একজন যুবক তার চারদিনের সন্তান ফেলে গ্রাম্য কোন্দলে মিথ্যা মামলায় জেলে ঢুকেছে। গত পাঁচ বছরেও কোন বিচার হয়নি। স্ত্রীর বাপেরা সন্তান সহ তাদের মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে চায়। এখন যুবকটি দিন-রাত কেঁদে বুক ভাসায়। হতদরিদ্র এই যুবকটির দেখার কেউ নেই। এমনিতর মিথ্যা মামলার ঘটনা প্রায় সবারই।

পরদিন সকালে স্যারকে টিনশেড কারা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তিনি একজন কয়েদীকে পান। সাড়ে চার বছর অপেক্ষা করেও মামলার কোন

অগ্রগতি না হওয়ায় তিন সন্তান ফেলে তার স্ত্রী সংসার ছেড়ে চলে গেছে। আরেকজন দল নিরপেক্ষ বি.এ পাশ যুবক সরকারী দল করতে রাযী না হওয়ায় দলীয় ক্যাডারদের ইঙ্গিতে গভীর রাতে পুলিশ গিয়ে তাকে থানায় ধরে আনে। অতঃপর পিটিয়ে হাড়-হাড্ডি ভেঙ্গে জাল টাকার মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠায়। অথচ তার মা লোকদের কাছে চেয়ে-চিন্তে খায়। তদবীর না হওয়ায় গোবিন্দগঞ্জের এই শিক্ষিত ছেলেটি আড়াই বছরের অধিক কারাগারে পড়ে আছে ডাণ্ডাবেড়ী পরা অবস্থায়। একই থানার আরেকজন বয়স্ক দাড়িওয়ালা ধার্মিক মানুষ তার ঔরসজাত কন্যাকে ধর্ষণ করেছে মর্মে মিথ্যা মামলার আসামী হয়ে কেঁদে দিন কাটাচ্ছে। ঘটনা এই যে, তার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইলেকশনের আগে তার কাছে টাকা ধার চায়। সে অপারগ হ'লে তার একমাত্র বকনা গরুটি জোর করে বিক্রি করে চেয়ারম্যান ১৯ হাযার টাকা নেয়। পরে দেবার ওয়াদা করলেও দেয়নি। তাই একদিন টাকা চাইতে গেলে চেয়ারম্যান তাকে গালি-গালাজ করে তাড়িয়ে দেয়। সপ্তাহ খানেক পরে হঠাৎ পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং ঐ নিকৃষ্ট মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। ফলে কোন উকিল তার পক্ষে দাঁড়াতে চায় না।

জমাদার এনামুল হক :

এই সময় জমাদার এনামুল হক এসে লম্বা সালাম দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, স্যার! আপনি জেলে আসায় আমরা ব্যথিত হ'লেও আনন্দিত। কেননা দেশী-বিদেশী সকল টিভি চ্যানেলে আপনাকে দেখানো হচ্ছে। সেই সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নামটা প্রচার হচ্ছে। এতে আমাদের সাহস বেড়েছে। আমি এখন মসজিদে গিয়ে প্রকাশ্যে বুকে হাত বেঁধে, রাফউল ইয়াদায়েন করে ও জোরে আমীন বলে ছালাত আদায় করি। কিন্তু এ যাবত সাহস হয়নি। বগুড়া গাবতলী পৌরসভার এই প্রবীণ জমাদারের মন্তব্য শুনে আমি হেসে ফেললাম। উল্লেখ্য যে, এই জেলে তখন কোন সুবেদার ছিলেন না।

আদালত প্রাঙ্গণে হাযারো মানুষের ঢল :

পরদিন ১০.০৩.০৫ইং তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে স্যারকে পলাশবাড়ী থানার তোকিয়ার বাজার গানের প্যাণ্ডেলে বোমা হামলা এবং মহিমাগঞ্জ ব্র্যাক অফিসে ডাকাতির মামলায় গাইবান্ধা যেলা আদালতে হাযির করা হয়।

আদালত প্রাঙ্গণে হাযার হাযার মানুষের সমাগম হয়। পলাশবাড়ীর অধিবাসী কারারক্ষী আব্দুর রঊফের বর্ণনা মতে সেদিন পলাশবাড়ী থেকে ২২ কি.মি. পথ হেঁটে শতশত নারী-পুরুষ গাইবান্ধা আদালতে গিয়েছিল স্যারকে এক নযর দেখার জন্য। এদিন স্যারের হাতে বার হাত লম্বা দড়ি বাঁধা অবস্থায় খালি মাথায় হাঁটতে থাকা দৃশ্য টেলিভিশনে দেখে বহু মানুষ কেঁদে বুক ভাসায়। কড়া নিরাপত্তায় ঠাসা আদালত কক্ষের মধ্যে স্যারের ২য় পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব সবাইকে ঠেলে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো স্যারের কাছে গিয়ে জোরালো কণ্ঠে বলে ওঠে, আব্বা আপনার মাথায় টুপী নেই কেন?' বিচারক ও উকিল সহ সকলের দৃষ্টি তখন বাপ-বেটার দিকে। স্যার ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দিলেন, যে দেশে টুপির মর্যাদা নেই সে দেশে টুপী মাথায় দিয়ে কি লাভ! অবশ্য পরে আর কখনো তিনি টুপী খোলেননি। এইদিনের মর্মান্তিক ছবিটি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচার হয়। যা দেখে দেশে-বিদেশে শত মানুষ সরকারকে ধিক্কার দেয়।

স্যার ২য় বার জেআইসিতে :

গাইবান্ধা আদালতে হাযিরার দিন স্যারের জ্বর ও লুজ মোশন ছিল। তাই সরাসরি তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন, আমি অসুস্থ। আমার একদিন বিশ্রাম প্রয়োজন। ম্যাজিস্ট্রেট সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আদেশ লিখলেন। পরে আদালত কক্ষ থেকে বের করে তাঁকে কারাগারে নেওয়া হয়। অতঃপর আধা ঘণ্টার মধ্যেই জেলার খবর দেন, প্রস্তুত হওয়ার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই জমাদার ও কারারক্ষীরা তাঁকে নিয়ে গেইটে আসেন। তখনও তিনি জানতেন না কোথায় তাঁকে নেওয়া হবে।

কারা ফটকে এসে নাজীবকে দেখে তিনি বিস্মিত হ'লেন। নাজীব স্যারকে এক সেট জামা-পায়জামা ও লুঙ্গি-গামছা দিল। ওখানে দাঁড়িয়েই স্যার পরনের লুঙ্গি ও জামা খুলে পাল্টে নিলেন। যা বিগত প্রায় দু'সপ্তাহ একটানা পরিহিত ছিলেন। জীবনে কখনই যা তাঁর অভ্যাস নয়। হঠাৎ নাজীবের চোখ স্যারের পায়ের দিকে পড়ে। ওদিকে জেলারের তাড়া। নাজীব মাথা ঝুঁকিয়ে লোহার শিকের দরজার ফাঁক গলিয়ে পায়ে হাত দিয়ে বলে, আব্বা শীঘ্র স্যাণ্ডেল খুলুন। বলেই সে নিজের পায়ের ৮০ টাকা দামের বার্মিজ স্যাণ্ডেল খুলে দিল

এবং স্যারের পা থেকে অনুরূপ মূল্যের ছেঁড়া বার্মিজ স্যাণ্ডেলটি খুলে নিল। এরপর পুলিশ ভ্যান স্যারকে নিয়ে চলে গেল।

দুপুরে গোবিন্দগঞ্জ থানায় এসে স্যার টয়লেটে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর হাতের দড়ি বাহির থেকে পুলিশে ধরে রইল। অতঃপর বেরিয়ে এসে তিনি যোহর-আছরের ছালাত আদায় করেন ও থানায় খাওয়া-দাওয়া করেন। থানার ওসির কথায় স্যার সেদিন মনে কষ্ট পান। তবে বিদায়ের সময় তিনি ভালো ব্যবহার করেন। রাস্তায় এসে আরেকবার টয়লেটে যেতে হয়। কিন্তু ঔষধ খাওয়ার কোন ব্যবস্থা হয়নি। এই অবস্থায় রাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানায় পৌঁছানো হয়। এসকর্ট দারোগা রাস্তায় বললেন যে, তিনি আগে থেকেই স্যারকে চিনেন। যখন স্যারের বিরুদ্ধে ২০০২ সালে সংগঠন থেকে বহিস্কৃত ব্যক্তিটি বগুড়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ঘর পোড়ানোর মিথ্যা মামলা দায়ের করে। তিনি ছিলেন ঐ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। তিনি ঐ ব্যক্তিকে একজন শঠ, ধূর্ত ও মতলববাজ বলে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন। উক্ত মামলায় স্যার বেকসুর খালাস পান।

ক্যান্টনমেন্ট থানার হাজত কক্ষে ময়লা-আবর্জনা পূর্ণ মেঝের উপর অসুস্থ অবস্থায় স্যার শুয়ে পড়েন। মাথার উপরে ১০০ পাওয়ারের বাল্ব। এরই মধ্যে রাত ৩-টার দিকে স্যার উঠেছেন তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য। তাহাজ্জুদ শেষ হওয়ার পর হাজতরক্ষী পুলিশ লোহার শিকের খোলা দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল, স্যার রাত ১০-টার দিকে আমার মাকে মোবাইলে আপনার কথা জানাই। তিনি এখন বাড়ীতে তাহাজ্জুদ পড়ছেন। কিছু আগে আমাকে ফোন করে বললেন, আমি যার 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' পড়ে তাহাজ্জুদ শিখেছি, তুমি আজ তাঁর রক্ষী। এই 'ছালাতুর রাসূল' বুকে নিয়েই তোমাকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি আমার আমীরে জামা'আতের যেন কোন কষ্ট না হয়'। বলেই পুলিশটি হু হু করে কাঁদতে লাগল...। বগুড়ার পূর্ব সৈয়দপুর গ্রামের ঐ তরুণ পুলিশ সদস্যটির অশ্রুভেজা চোখের স্মৃতি আজও ভুলতে পারি না।

তার দু'দিন পরে জনৈক নতুন রক্ষী গভীর রাতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাতর কণ্ঠে বলল, স্যার বাসায় খবর দিব কি? ফোন নম্বরটা বলবেন কি? স্যার বললেন, তুমি কে? তিনি পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম এই। আপনার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে আমার বাড়ী। স্যার তাকে ধন্যবাদ দিলেন।

পরের দিন রিম্যাণ্ডে এসে স্যার দায়িত্বশীল এসকর্ট দারোগার মাধ্যমে দরখাস্ত করে ক্ষৌরকর্মের জন্য কাঁচি-আয়না-ব্লেড ও বাড়ীতে ফোন করার জন্য অনুমতি চাইলেন। কিন্তু অনুমতি মেলেনি। ২য় জেআইসিতে প্রথটির মত হালকাভাবে জিজ্ঞেসাবাদ করা হয়। তবে একদিন তারা বেশ উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করে, স্যার আপনি কি দেশের সংবিধান মানেন না? স্যার বললেন, মানি। তখন তারা স্যারকে তাঁর বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় দেওয়া ভাষণের একাংশ শুনিয়ে দিল। যেখানে তিনি বলেছেন, 'কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরুদ্ধে কিছুই আমরা মানি না। এমনকি যদি তা সংবিধানেও থাকে'। স্যার বললেন, আমরা এমন সংবিধান মানি যে, বিগত চৌদ্দশত বছরেও তাতে কোন সংশোধনী আসেনি। অথচ দেশের সংবিধানে ইতিমধ্যে চৌদ্দটি সংশোধনী এসেছে। অতএব প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ প্রেরিত নির্ভুল সংবিধান পবিত্র কুরআন মেনে চলা। এরপরেও আমরা বাধ্যগতভাবে দেশের সংবিধান মেনে চলি। পরে জানা গেল, প্রতিদিন ওরা অন্য ঘরে স্যারের বাসা থেকে আনা ভাষণসমূহের ক্যাসেট শুনত। যাতে সেখান থেকে আপত্তিজনক কিছু পেলে স্যারকে প্রশ্ন করা যায়। কিন্তু তেমন কিছুই পায়নি ঐ একটি প্রশ্ন ছাড়া। এভাবে ১০দিন কাটিয়ে স্যারকে পুনরায় গাইবান্ধা কারাগারে ১৯.০৩.০৫ইং তারিখে ফিরিয়ে আনা হয়।

স্যার গাইবান্ধা থেকে গোপালগঞ্জ কারাগারে :

পরদিন ২০.০৩.০৫ইং তারিখ রবিবার গাইবান্ধা আদালতে হাযির করে গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় ব্যাংক ডাকাতি মামলায় হাযিরা দেওয়ার জন্য বিকাল ৩-টা ২০ মিনিটে গাইবান্ধা থেকে স্যারকে নিয়ে পুলিশের গাড়ী রওয়ানা হয়। আত-তাহরীকের সার্কুলেশন ম্যানেজার গাইবান্ধা সাঘাটার আবুল কালাম এ সময় দ্রুত একটা পলিথিনের প্যাকেট দিল। যাতে পাউরুটি, বিস্কুট ও একটি ছোট তোয়ালে ছিল। যা পরে খুবই উপকারী প্রমাণিত হ'ল। গত ২০.১০.১১ ইং তারিখে আবুল কালাম আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেছে। আল্লাহ তাকে জান্নাত নছীব করুন-আমীন!

রাস্তায় সন্ধ্যার পরে ঘন অন্ধকারের মধ্যে ঝিনাইদহ-মাগুরার মধ্যবর্তী ফাঁকা সড়কে পুলিশের গাড়ী হঠাৎ থেমে যায়। স্যার বললেন, আমার মনে হ'ল

হয়তোবা এখন ক্রসফায়ারে হত্যা করবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, ওরা পেশাব করার জন্য থেমেছে। তখন স্যার গাড়ী থেকে নেমে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে ঘাসের উপর মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও কৃছর করে নেন। অতঃপর রাস্তা ভুল করে ফরিদপুর হয়ে রাত ১২-টা ২০ মিনিটে পুলিশের গাড়ী গোপালগঞ্জ কারাগারে পৌঁছে। ডেপুটি জেলার অত্যন্ত ভদ্র যুবক। হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, এত রাতে স্যার আপনার জন্য কি খাওয়ার ব্যবস্থা করব, তাই ভাবছি। তখন স্যার বললেন, গাইবান্ধা থেকে পুলিশ ভ্যানে উঠার সময় আমাদের এক কর্মী পাউরুটি ও কলা দিয়েছিল। ওটাতেই চলবে’।...

ইতিমধ্যে লকআপের সময় হয়ে গেল। সুবেদার গোলাম হোসেন এসে আমীরে জামা‘আতের জন্য পরিষ্কার করা পাশের কক্ষটি দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু আমীরে জামা‘আত বললেন, আমি আমার সাথীদের সাথেই থাকতে চাই। ফলে সুবেদার চলে গেলেন। আমরা একসাথেই রাত্রি যাপন করলাম। তারপর স্যারের নিকট আমরা গোপালগঞ্জ কারাগারে তাঁর অভিজ্ঞতা শুনতে চাইলাম। যদিও স্যারের ১১দিন পূর্বেই আমরা ঐ কারাগার থেকে নওগাঁ কারাগারে এসেছি।

স্যার বললেন, রাতেই আমাকে একটা টিনশেড সাধারণ ওয়ার্ডে নেওয়া হ’ল। যেখানে আমাকে দিয়ে ৫০জন হ’ল। ওয়ার্ডের সাথীরা ডেপুটি জেলার ও জমাদারের কাছে পরিচয় পেয়ে যথেষ্ট সমাদর করল। তারা বলল, স্যার আপনার সাথীরা এখানে এসেছিলেন। সবাই ভালো মানুষ। তবে কেইস পার্টনার তরুণ ছেলেটি খুবই কান্নাকাটি করত। পরে কারা কর্তৃপক্ষ তার বাড়ীতে ফোনে জানালে তার শ্বশুর এসে দেখা করে গেছেন। বললাম, তরুণ ছেলে হিসাবে এটাতো হ’তেই পারে। বড় টিনশেড ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র দু’টি ফ্যান। ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আমাকে জায়গা করে দিল। হাজতীদের দেওয়া চাদরে ও বালিশে শোয়ার ব্যবস্থা হ’ল। মশার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য ওদের একজন তার এ্যারোসলটি আমাকে দিল। অন্যদিকে ডেপুটি জেলারও একটি পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু মশা এসবের তোয়াক্কা করে না।

সকালে উঠে ফজরের জামা‘আত করলাম। মুছল্লী পেলাম পাঁচ জনের মত। সালাম ফিরে বসে সবাইকে উঠিয়ে কুরআনের দরস দিলাম। এরপর থেকে

দু'জন হিন্দু বাদে সবাই প্রতি ওয়াক্তে আমার সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করেছে। সন্ধ্যায় দেখি টিনের চালের উপরে ধমধম করে শব্দ হচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, এখন সবাইকে 'ধ্যান' করতে হবে। জমাদারকে ডেকে বললাম, এটা কেন করছেন? তিনি বললেন, স্যার! বৃটিশ আমল থেকেই এ নিয়ম চলে আসছে। বললাম, এ নিয়ম বাতিল করতে হবে। এখন থেকে এখানে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে আযান হবে। অতঃপর যার যার ওয়ার্ডে ছালাতের জামা'আত হবে। উনি খুশী হ'লেন এবং সেটাই কার্যকর হ'ল।

পরদিন সকালে আমাকে আদালতে নেওয়া হবে। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেলেও নেওয়া হ'ল না। বিকালে জেলার ও জমাদার এসে বললেন, স্যার নিরাপত্তার কথা ভেবে আপনাকে আদালতে নেওয়া হয়নি। গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্ট হ'ল এই যে, আপনাকে দেখার জন্য গোপালগঞ্জ শহরে এত লোক সমাগম হয়েছে যে, কোন হোটেলেই সীট খালি নেই। এছাড়াও রাস্তা-ঘাটে প্রচুর মানুষ। সবার মুখে একই কথা 'গালিব স্যার কখন আসবেন'। যেলার একটি প্রসিদ্ধ (গওহরডাঙ্গা) মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকরা বাস রিজার্ভ করে এসেছে। তারা বলাবলি করছে, আজকে আমাদের যেলায় আল্লাহ্‌র একজন বড় অলী আসবেন। তাই মাদরাসা ছুটি দেওয়া হয়েছে'। সব দিক বিবেচনা করে প্রশাসন আপনাকে বের করেনি।

স্যার ভেবেছিলেন গোপালগঞ্জ শহরের মিঞাপাড়ায় আহলেহাদীছদের জন্য তিনি যে জামে মসজিদটি করে দিয়েছেন, যেখানে তিনি নিজে সফর করেছেন, সেই মসজিদের কমিটিতে দু'জন সিনিয়র এ্যাডভোকেট আছেন। তারা অন্তত এই মামলায় স্বেচ্ছায় তাঁর উকিল হবেন এবং জেলখানায় দেখতে আসবেন। কিন্তু চারদিনের মধ্যে কেউ আসেননি। একইভাবে গাইবান্ধা পুরাতন জেলখানার পূর্ব পার্শ্বে রাস্তার বিপরীতে গাইবান্ধা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতির বাড়ী। তার ভাতিজার দোকান জেলখানার গেইটের সামনেই। কিন্তু তাদের কেউ কখনও আমীরে জামা'আতকে জেলখানায় দেখতে আসেননি। এমনকি তিনি মুক্তি পাওয়ার পরেও দেখা করেননি। অথচ দূরবর্তী পলাশবাড়ী পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহ থেকে শত শত নারী-পুরুষ গাইবান্ধা আদালতে গিয়েছিল আমীরে জামা'আতকে এক নযর দেখার জন্য। এটাই হ'ল মানুষের চরিত্র।

গোপালগঞ্জ কারাগারে চারদিনের দাওয়াতে একজন হাফেযসহ ছয় জন প্রকাশ্যভাবে 'আহলেহাদীছ' হন। বাকী প্রায় সবাই ছিলেন ভক্ত। কারাগারের চৌকাটি ছিল শেখ মুজিবের বৈঠকখানা। তাঁর বাপ নাকি বলতেন, 'ছেলে যখন সব সময় জেলেই থাকে, তখন ওর বৈঠকখানাটা জেলখানাকেই দান করে দাও'। পরে নাকি সেটাই করা হয়। কারাগারের ভাষায় 'চৌকা' অর্থ রান্নাঘর।

আমি যখন ঢাকা কারাগারে, তখন আমাকে দেখার জন্য ঢাকা ও নরসিংদী যেলা সংগঠনের কয়েকজন আসেন। কিন্তু নিয়ম জানা না থাকায় তারা বেশ সমস্যায় পড়েন। জনৈক কারারক্ষী পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা আমার কথা বলেন। তখন তিনি ভক্তির সাথে সব ব্যবস্থা করে দেন। সে সময় তিনি গোপালগঞ্জ কারাগারে আমার ব্যাপারে তার স্মৃতিচারণ করে তাদের নিকট ভূয়সী প্রশংসা করেন। গোপালগঞ্জের মামলা শেষ হ'লে তার ফাইনাল রিপোর্টের কপি আনতে কর্মীরা ব্যর্থ হ'লে গোপালগঞ্জ কারাগারের ডেপুটি স্বেচ্ছায় ও নিজ চেষ্টায় আদালত থেকে কপি এনে বগুড়া কারাগারে পাঠিয়ে দেন। এসবই ছিল আমাদের প্রতি তাদের ভালবাসা ও ভক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

গোপালগঞ্জ কারাগারে থাকা অবস্থায় একদিন জমাদার এসে বললেন, স্যার মাতালদের কাণ্ড দেখুন। ওরা একটা আস্ত টিকটিকি ধরে খেয়ে ফেলেছে। বললাম, কেন? উনি বললেন, টিকটিকির লেজে মাদকতা আছে। ওটা পুড়িয়ে খেলে মাদকতা আরও বাড়ে। পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পুড়িয়ে খাওয়ার উপায় নেই। তাই ওটা ধরে আস্ত খেয়ে ফেলেছে। এটি পাশের ওয়ার্ডের ঘটনা। এতে আমি শিক্ষা পেলাম এই যে, হাদীছে এক আঘাতে টিকটিকি মারলে ১০০ নেকী ও দুই আঘাতে মারলে ৫০ নেকীর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেন বলা হয়েছে তা এখন বুঝলাম। অতএব হাদীছ মানার মধ্যেই বরকত রয়েছে। যুক্তি তালাশ করার মধ্যে নয়।

দ্বিতীয় দিন ২২.০৩.০৫ইং মঙ্গলবার বিকালে ডিসি-এসপি ও বিএনপি নেতা সহ কয়েকজন আমাকে দেখতে এলেন। কারাগারের নিয়ম হ'ল এ সময় সবাইকে বিছানা গুটিয়ে মামলার টিকেট হাতে নিয়ে লাইন দিয়ে উপুড় হাঁটুতে বসে থাকতে হয়। এটা আমার মেযাজের খেলাফ। আমি আমার বিছানায় বসে রইলাম। ডিসি ছাহেব সরাসরি এসে আমাকে সালাম দিলেন। তখন আমি

উঠে দাঁড়াই এবং মুছাফাহা করে তাঁকে কিছু কথা বলি। যেমন, (১) অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তিকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করা ও বিনা বিচারে হাজতের নামে কারা নির্যাতন ভোগ করানো কি যুলুম নয়? (২) কারা কক্ষের মধ্যে ডাণ্ডাবেড়ী পরিয়ে স্বাধীন মানুষের প্রতি ক্রীতদাস সূলভ আচরণ করা কি অন্যায় নয়? (৩) নিরপরাধ মানুষকে স্রেফ সন্দেহ বশে থানায় নিয়ে মারপিট করা ও ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা কি মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন নয়? (৪) মযলূমের দো'আয় আল্লাহ্র আরশ কেঁপে ওঠে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে (খালেদা জিয়া) বলতে চাই, তিনি যেন আমাদের মত হাজতের নামে কারা নির্যাতন ভোগকারী অগণিত নিরপরাধ মানুষকে সত্বর মুক্তি দানের ব্যবস্থা করেন এবং মেয়াদবিহীন হাজতী প্রথা বাতিল করেন। এতে তিনি আল্লাহ্র রহমত প্রাপ্ত হবেন'।

জবাবে তাঁরা কোন কথা বলেননি। কিন্তু তাদের যাওয়ার পর উপস্থিত সাথীদের মধ্যে আনন্দের যে উচ্ছ্বাস সেদিন দেখেছিলাম, তা কখনই ভুলবার নয়। তারা বলল, 'আমাদের দীর্ঘ কারাজীবনে আজই প্রথম প্রশাসনের সামনে এরূপ হক কথা বলতে শুনলাম'। আমি মনে করি, সেদিন আসবেই, যেদিন মযলূম বিজয়ী হবে। যালেম পরাজিত হবে। কারা কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞচিত্তে সেদিন আমাকে যে প্রাণভরা অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন, তা সর্বদা মনে থাকবে। বলা চলে যে, যালেমের বিরুদ্ধে তাদের অধীনস্তদেরও আক্রোশ ধূমায়িত থাকে। যা সুযোগ মত বেরিয়ে আসে। রাতের বেলায় জেলার ও ডেপুটি জেলার এসে বললেন, স্যার যাওয়ার বেলায় ডিসি ছাহেব মন্তব্য করলেন, এইসব পণ্ডিত মানুষকে সরকার যে কেন জেলখানায় আনল বুঝতে পারি না'। বললেন, আপনারা উনাকে সাধ্যমত যত্ন করবেন'।

উল্লেখ্য যে, আমাদের ওয়ার্ডে ঐ সময় রাজশাহীর একটা হালকা-পাতলা ছেলে ছিল। যার দু'পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী পরানো ছিল। যা তার পায়ে দিন-রাত সর্বদা থাকত। আমার জীবনে এই প্রথম ডাণ্ডাবেড়ী দেখলাম। অথচ সেই-ই ছিল ওয়ার্ডের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ ও পরহেযগার ছেলে। আরেকটি যুবক ছিল যাকে থানায় মেরে হাত-পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। অনেক দিন

হাসপাতালে থেকে কয়েকদিন আগে কারাগারে আনা হয়েছে। পাশের ওয়ার্ডে মোল্লাহাটের একটা আহলেহাদীছ তরুণ ছিল। যাকে রাতের বেলা ক্রসফায়ার দিতে নিয়ে গিয়েছিল। পরে চাহিদা মত টাকার আশ্বাস পেয়ে থানায় ফিরিয়ে আনা হয়।

২৫ তারিখ শুক্রবার ফজর ছালাতের পর কুরআনের দরস দেওয়ার সময় যখন জমাদার এসে আমাকে প্রস্তুতি নিতে বললেন, তখন সাথীদের মধ্যে কান্নার গুঞ্জন উঠে গেল। সবশেষে কে কোনটা আমাকে হাদিয়া দিবে, সেই প্রতিযোগিতা শুরু হ'ল। গফরগাঁও নিবাসী তরুণ ডেপুটি জেলার বাহারুল ইসলাম ও জমাদার এসে আবেগ ভরা কণ্ঠে ক্ষমা চেয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। গোপালগঞ্জ পুরাতন কারাগারের স্মৃতি তাই আমার জীবনে অম্লান হয়ে রইল। মযলূম মানুষদের ভালবাসায় যা সিক্ত এবং নিখাদ শ্রদ্ধায় যা আপ্লুত।

এদিন আসার সময় দেখলাম এসএসএফ এসকর্ট বাহিনী। যা রাষ্ট্রের ভিভিআইপিদের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। স্মার্ট এই তরুণ পুলিশ সদস্যদের জিজ্ঞেস করলে টাঙ্গাইলের পুলিশটি বলল, স্যার আপনার বিষয়ে উপর থেকে বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। সারা পথ তারা দ্বীনের নছীহত শুনেছে ও অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছে। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অতিক্রম করার সময় তারা বলল, স্যার এখানে আপনার সংগঠন আছে কি? আমি কিছুই বললাম না। কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর গেইটে নেমে ওরা নাশতা করল। আমাকেও করালো। ভাবছিলাম পরিচিত কেউ এসে না পড়ে। তাই গাড়ীর মধ্যে বসেই নাশতা করলাম। পয়সা ওরাই দিল। এসকর্ট দারোগা ১০০ টাকার নোট দিলেন। কিন্তু দোকানদার বাকী টাকা ফেরৎ দিল না। উল্টা পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করল। যোগ দিল পাশের দোকানদাররাও। এতে পুলিশের মেযাজ গরম হওয়া স্বাভাবিক। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি দ্রুত ওদেরকে ফিরে আসতে বললাম। কাছে এলে অফিসারকে বললাম, ১০০ টাকা যাক। আপনি সম্মান বাঁচিয়ে চলে আসুন। তিনি কথা মানলেন। অতঃপর দ্রুত গাড়ী স্টার্ট করে আমরা চলে এলাম। এখানে পুলিশ অফিসারের আদৌ কোন দোষ ছিল না।

নাটোর আসার পরে ওরা বগুড়া হয়ে যেতে চাইল। আমি রাজশাহী হয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলাম। ওরা মেনে নিল। অতঃপর নওদাপাড়া মারকায

অতিক্রম করার সময় অফিসার বলে উঠলেন, স্যার এইতো আহলেহাদীছ-এর কেন্দ্র। আমি বললাম, হ্যাঁ। আর কিছুই না বলে বারবার তাকাচ্ছিলাম ডাইনে ও বামে। কিন্তু কাউকে পাইনি। বাসার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম ছোট ছেলেটি (আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির) হয়ত নীচে মাঠে খেলা-ধূলা করছে। কিন্তু তাকেও পাইনি। তখন বেলা ১১-টা ২০ মিনিট। দেখলাম শিক্ষক সাঈদুর রহমান কেবল মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বের বড় মসজিদে প্রবেশ করছেন। অতঃপর অব্যক্ত বেদনা নিয়ে জুম'আর কিছু পূর্বে নওগাঁ নতুন কারাগারের ফটকে এসে উপস্থিত হ'লাম।....

নওগাঁ কারাগারের অন্যান্য ঘটনা

(১) দরসে কুরআন : নওগাঁ জেলখানায় প্রথম রাত্রি শেষে আমীরে জামা'আতের ইমামতিতে আমরা ফজরের ছালাত আদায় করি। এদিন তিনি সূরা মা'আরেজ তেলাওয়াত করেন এবং তার উপরেই দরসে কুরআন পেশ করেন। যেখানে ৫-৭ আয়াতে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলছেন, 'তুমি উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ কর'। 'তারা আমার শাস্তিকে (ক্বিয়ামত) বহু দূর মনে করে'। 'অথচ আমরা একে নিকটবর্তী মনে করি'। অতঃপর সূরার শেষ দিকে ৪০-৪২ আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আমরা উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের শপথ করে বলছি, নিশ্চয় আমরা সক্ষম'। 'তাদের পরিবর্তে উত্তম মানুষ সৃষ্টি করতে। আর এটা আমাদের সাধ্যের অতীত নয়'। 'অতএব তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও। তারা বাক-বিতণ্ডা ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকুক প্রতিশ্রুত (ক্বিয়ামত) দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত' *(মা'আরেজ ৭০/৪০-৪২)*। সেদিনের এই দরস যালেমদের বিরুদ্ধে আমাদের সকল ক্ষোভ মিটিয়ে দেয়। আমরা আল্লাহ্র ফায়ছালার উপর খুশী হয়ে যাই।

(২) বন্দীদের ডাণ্ডাবেড়ী খোলা ও মুক্ত আকাশের নীচে আগমন : আমাদের সেলের পিছনে অধিকাংশ সেলেই ছিল পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির আসামীরা। এক একজনের একাধিক মামলা থাকার কারণে সবার পায়ে সর্বদা ডাণ্ডাবেড়ী পরানো থাকত। উঠা-বসা ও নড়া-চড়ার সময় বালায় বালায় ঘর্ষণে ঝনঝন শব্দ হ'ত। বহু কয়েদী ও হাজতী এসব সেলে থাকত। কারো কারো দশ বারো বছর ধরে ডাণ্ডাবেড়ী পরে থাকার কারণে পায়ের নির্দিষ্ট স্থানগুলি

মহিষের কাঁধের মত কালো ও শক্ত হয়ে গেছে। দীর্ঘ দিন একই অবস্থা একই স্থানে থাকলেও ওরা ঐ শব্দে ও বেড়ীতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেলের কক্ষের মধ্যেই থাকতে হ'ত। আলো-বাতাসের মুখ ওরা দেখতে পেত না।

স্যার সকালেই আমাকে ডেকে বললেন, নূরুল ইসলাম! ঐ শব্দগুলো কিসের? আমি বিস্তারিত বললে তিনি ওদের দীর্ঘ দিনের ডাণ্ডাবেড়ীর মর্মান্তিক কষ্টের কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হন। অতঃপর সুবেদার ছাহেব এলে তিনি তাঁকে বলেন, সুবেদার ছাহেব! এরা কি মানুষ নয়? পশুকেও মানুষ শিকল দিয়ে এভাবে বেঁধে রাখে না। এক্ষুণি এদের ডাণ্ডাবেড়ী খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন'। সুবেদার উত্তরে বললেন, স্যার আমি নিজেও এর বিরোধী। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। এটা 'কারাগারের বিধান'। তবে আমি সুপার ছাহেবকে বলে কিছু করা যায় কি না দেখব।

(৩) পানির বোতল, আলু ভর্তা ও ডাল : ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে উন্নত মানের খাবার দেওয়া হ'ল। অর্থাৎ সকালে ফিরনী ও মুড়ি। দুপুরে পোলাও ভাত, এক টুকরা মাছ ভাজি ও ঝোলওয়ালা গোশত। পরদিন ২৭শে মার্চ কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী নাশতার জন্য একটা করে রুটি ও গুড় এল। দুপুরে দু'টি রুটি ও গুড়। রাতে সবজি ও ডাল। যা অধিকাংশ সময় পুঁই শাকের পাতা। আমীরে জামা'আত বললেন, এটা চলবে না। জেলার এলেন। তিনি তাঁকে দুপুরে ভাত, আলু ভর্তা ও ডালের কথা বলে দিলেন। পাশ হয়ে গেল। এছাড়া আমাদের জন্য বাহির থেকে পিয়াজ, মরিচ, সরিষার তৈল ইত্যাদি আনার অনুমতি হ'ল। আযীযুল্লাহ্‌র ভাষায় দুপুরে ভাত, আলু ভর্তা ও ডাল কারাগারের 'রাজকীয় খানা'। পাশের কক্ষের ফাঁসির আসামীদের ঘন ডাল দেওয়া হ'ত। ওরা সেই ডাল নিংড়িয়ে শুকনা করে আমাদের দিত। আমরা ওটা পেয়াজ-মরিচ ও সরিষার তৈল দিয়ে মাখিয়ে ছানা বানিয়ে ওদের দিতাম। আমরাও খেতাম। কারাজীবনে এটাও ছিল অন্যতম 'রাজকীয় ভর্তা'।

আগেই বলেছি, আমীরে জামা'আতের কারণে আমরা ডাণ্ডাবেড়ী থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। তিনি নওগাঁ থেকে অন্য কারাগারে চলে যাওয়ার পরেও আমাদের জন্য তা অব্যাহত ছিল। সেই সাথে দুপুরে ভাত, আলু ভর্তা ও ডাল অব্যাহত ছিল। কর্তা ব্যক্তিরা জেল পরিদর্শনে এলে আমীরে জামা'আতের

কেস পার্টনার হিসাবে আমাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন। যেমন একদিন একজন কর্মকর্তা জেল পরিদর্শনে এসে আমাদের কক্ষ ছাড়িয়ে চলে গেলেও পুনরায় ফিরে আসেন এবং আমাদের সাথে বিশেষভাবে কুশল বিনিময় করেন। সালাফী ছাহেব এ সময় সর্বদা নিজেকে আমীরে জামা'আতের 'সেকেণ্ড ম্যান' বলে পরিদর্শকদের সামনে নিজের পরিচয় দিতেন। তাঁকে একবার ঢাকা কারাগারে নেওয়া হ'লে সেখান থেকে ফিরে এসে আমাদের বললেন, ঢাকা কারাগারের আমদানী ওয়ার্ডের অব্যবস্থাপনা অবর্ণনীয়। আমি অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি। ভিড়ের মধ্যে আমি কোন দিশা পাচ্ছি না। হঠাৎ একজন কয়েদী এসে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে আমি তার কাছে আমীরে জামা'আতের নাম বলি এবং নিজেকে তাঁর কেস পার্টনার হিসাবে পরিচয় দেই। তাতেই সে ভক্তিতে গদগদ হয়ে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভালভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। পরে বুঝলাম সে একজন প্রভাবশালী ম্যাট।

(৪) এডিশনাল আইজি প্রিজনের আগমন :

ঢাকা থেকে এডিশনাল আইজি প্রিজনের নওগাঁ জেলখানা পরিদর্শনের কথা। হয়তবা আমীরে জামা'আতকে দেখতে এসেছেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেদিন কারাগার পরিদর্শনে আসেন, সেদিন এর চেহারা পাল্টে যায়। খাবারের মান সুন্দর হয়ে যায়। সকালে সুবেদার এসে স্যারকে অনুরোধের স্বরে বললেন, দয়া করে কোন বিষয়ে অভিযোগ করবেন না স্যার। তাতে আমরা মহা বিপদে পড়ব। এমনকি চাকরীও চলে যেতে পারে। স্যার হাসতে হাসতে বললেন, কয়েদীদের হক নষ্ট করবেন না- অভিযোগ দিব না। নইলে যা বলার তাই বলব। জেলখানায় পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠল। সমস্ত ওয়ার্ড ও সেল বন্ধ করে দেওয়া হ'ল।

(৫) বেড়ী খোলা সমাচার : এডিশনাল আইজি এক এক করে সমস্ত ওয়ার্ড ঘুরে সবশেষে আমাদের সেলে এসে সালাম দিয়ে বললেন, কেমন আছেন স্যার? উত্তরে স্যার বললেন, *আলহামদুলিল্লাহ* ভাল আছি। তবে সিংহকে আর কত দিন এভাবে লোহার খাঁচায় বন্দী রাখবেন? উনি চুপ থাকলেন। তারপর স্যার বললেন, আপনার কাছে আমার দু'টি বিষয়ে নিবেদন। (এক)

কয়েদীদের ডাণ্ডাবেড়ী পরানোর নিয়মটি বাতিল করুন। জেলখানার বিশাল উঁচু প্রাচীর, তার মধ্যে সেলের দশ ফুট উঁচু প্রাচীর, তার মধ্যে এত কারারক্ষীদের ডিঙ্গিয়ে ওরা কিভাবে পালিয়ে যাবে? এডিশনাল আইজি বললেন, স্যার আমাদের কিছু করার নেই। ১৯০৮ সালে বৃটিশ সরকার যে জেলকোড লিখে গেছেন, তা আজও পরিবর্তন হয়নি। আমীরে জামা'আত বললেন, বৃটিশকে তাড়ালেন, পাকিস্তানকে তাড়ালেন, কিন্তু তাদের আইন তাড়াতে পারলেন না? স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষগুলিকে আজও জেলখানার মধ্যে ডাণ্ডাবেড়ীর শৃংখলে আবদ্ধ রাখবেন? আমরা ওদের পায়ের বেড়ীগুলি সর্বদা খোলা দেখতে চাই। (দুই) সারা দেশের হাযার হাযার কয়েদী ও হাজতীদের শুক্রবারের জুম'আর ছালাত থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। তারা যদি হাশরের ময়দানে আল্লাহ্র কাছে বাদী হয় যে, কারা কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জুম'আর ছালাত আদায় করতে দেয়নি, তাহ'লে সেদিন আল্লাহ্র কাছে আপনারা কি জবাবদিহী করবেন? স্যার বললেন, প্রত্যেক জেলখানার ভিতরে জামে মসজিদ তৈরী করতে হবে। না হ'লে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জুম'আ আদায়ের ব্যবস্থা নিন। মুসলিম কারাবন্দীগণ যাতে শুক্রবারে এক সাথে ছালাত আদায় করতে পারে। সেখানে প্রয়োজনে বাহির থেকে সৎ ও তাক্বওয়াশীল বিজ্ঞ আলেমদের নিয়ে এসে খুৎবায় আল্লাহভীতির নছীহত করতে হবে। খারাপ পথ থেকে ভাল পথে ফিরে আসার উপদেশ দিতে হবে। আখেরাতে মুক্তির উপায় বলতে হবে। তবেই তো একজন পাপী জেলখানায় এসে পাপ মুক্ত হয়ে সৎ মানুষ হয়ে ফিরে যাবে। এডিশনাল আইজি বললেন, স্যার আপনার পরামর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করব। আমার জন্য দো'আ করবেন।

পরের দিন দেখা গেল সুবেদার এসে সবার ডাণ্ডাবেড়ী খুলে দিলেন। কেবল আদালতে নেওয়ার সময় ডাণ্ডাবেড়ী পরানো হ'ত। তাছাড়া সেলের মধ্যে কক্ষের বাইরে আসার অনুমতি দেওয়া হ'ল। ফলে দীর্ঘ দিনের কক্ষবন্দী এই মানুষগুলো মুক্ত আকাশের নীচে চলাফেরার সুযোগ পেয়ে ধন্য হ'ল। আমাদের পাশের কক্ষের ফাঁসির আসামীরা প্রতিদিন বিকালে বের হওয়ার সুযোগ পেল।

খাঁচার পাখি মুক্তি পেলে যেমন আনন্দে ডানা মেলে আকাশে উড়তে থাকে, ওরাও তেমনি বহুদিনের শিকল পরা বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দে

স্যারের প্রশংসায় উল্লাস করতে লাগল। *আলহামদুলিল্লাহ।* দেখা হ'লেই ওরা বলত, স্যারকেই আমরা এদেশের 'প্রেসিডেন্ট' পদে দেখতে চাই। স্যার আসার সাথে সাথে জেলখানার পরিবেশ উন্নত হয়েছে। খাবার মান ভাল হয়েছে। ম্যাটদের অত্যাচার কমেছে। সারা জেলখানায় যেন একটা স্বস্তি ও শান্তির বাতাস বয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, সুপার, জেলার বা সুবেদার যখনই কেউ স্যারের কাছে আসতেন, তিনি তাদেরকে বন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের উপদেশ দিতেন ও আল্লাহ্র বাণী শুনাতেন।

এই ঘটনার প্রায় ১০ বছর পর গত ২৯শে এপ্রিল'১৫ তারিখে রাজশাহী কারাগার থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত রাজশাহী শহরের একটি প্রসিদ্ধ কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল ছাহেব সাক্ষাৎ করতে এসে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে বলেন, স্যার! নওগাঁ জেলের আপনার একজন কারাসাথী আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি দীর্ঘ দিনের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী। তিনি বলেছেন, স্যারের কারণেই আমরা আজ বেড়ী মুক্ত। দীর্ঘদিন ডাণ্ডাবেড়ী পরার কারণে আমাদের পাগুলি কালো কুচকুচে ও শক্ত হয়ে গেছে। কখনো কখনো সেখানে পচন ধরে। আমার মত অসংখ্য বেড়ী মুক্ত কয়েদী স্যারের জন্য সর্বদা দো'আ করে থাকি। কত নেতা জেলে এসেছে, গিয়েছে, কত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু কারু কাছ থেকে কারাবন্দীরা সামান্য উপকার বা সহানুভূতি পায়নি। স্যার কোন রাজনৈতিক দলের নেতা নন। কেবলই মানবিক তাকীদ থেকে তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন, তা আমরা আমৃত্যু স্মরণ করব ও তাঁর জন্য প্রাণ ভরে দো'আ করব।

(৬) লাল পানি সমাচার : নওগাঁ জেলের পানি ছিল লাল। আয়রনে ভরা। আমাদের জন্য বাহির থেকে পানির বোতল আনার সুযোগ দেওয়া হ'ল। আযীযুল্লাহ সেই খালি বোতলে ইটের ও কয়লার টুকরা এবং বালি ভরে তাতে অন্য একটি বোতল থেকে স্যালাইনের পাইপের মাধ্যমে ফোঁটায় ফোঁটায় আয়রনযুক্ত পানি ফেলে পানি ফ্রেশ করার বুদ্ধি বের করল। যা নীচে পৃথক একটি খালি বোতলে ফোঁটা ফোঁটা করে জমত। যেটা পরে আমরা পান করতাম। আমাদের অতিরিক্ত খালি বোতলগুলি ক্রমে সারা কারাগারে চলে গেল ও সেখানে একই পদ্ধতিতে পানি পরিষ্কার করার ব্যবস্থা হ'ল। এমনকি জেলার ও সুপার ছাহেবও উক্ত পদ্ধতি নিজেদের বাসায় চালু করেন।

আমীরে জামা'আত সুপার ছাহেবকে বলেছিলেন, আপনি কয়েদীদের নিকট থেকে দশ টাকা করে নিয়ে হ'লেও যেলা শহরের মেইন লাইন থেকে লাইন টেনে ফ্রেশ পানি আনার ব্যবস্থা করুন। আমরা টাকা দিব। তিনি বললেন, এটা জানতে পারলে সাংবাদিকরা পিছে লাগবে এবং বলবে যে, আমি আপনাদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছি। অথচ সরকারের কাছে বারবার আবেদন করেও টাকা পাচ্ছি না। ফলে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে।

(৭) নওগাঁ সদর থানায় রিম্যাণ্ড : কয়েকদিন একত্রে থাকার পর ২৯.০৩.০৫ইং মঙ্গলবার নওগাঁর দু'টি মামলায় আমাদের হাযিরা দেওয়ার জন্য আদালতে নেওয়া হ'ল। আদালত আমাদের ৪দিনের রিম্যাণ্ড মনযূর করল। সেদিন ছিল আদালত প্রাঙ্গণে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতা-কর্মী এবং সাধারণ মানুষের ঢল। অনেকের ছিল অশ্রুভেজা চক্ষু। আদালত থেকে সরাসরি থানা হাজতে নেওয়া হ'ল। ওসি ছাহেব থানা হাজতের একটি কক্ষ পরিচ্ছন্ন করে আমাদেরকে সসম্মানে থাকার ব্যবস্থা করলেন। ঐদিন অফিস সহকারী মুফাক্ষার ভাইয়ের পাঠানো নতুন বড় চাদরটি বিছিয়ে আমীরে জামা'আত পাশের কক্ষে একাকী শুয়েছিলেন। তিনি বারবার মুফাক্ষারের জন্য দো'আ করেছিলেন। চাদর পাওয়ার আগে আমীরে জামা'আত পরিহিত পাজামা-পাঞ্জাবী সহ খালি মেঝেয় শুয়ে পড়েন। এ দৃশ্য দেখে জনৈকা মহিলা পুলিশ অফিসার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। আমীরে জামা'আত বিষয়টি টের পেয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি কাঁপা গলায় বলেন, স্যার আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলাম। এরপর তিনি আর কোন কথা বলতে পারেন নি...। এই ঘটনার কিছু পর ওসি ছাহেব এসে জিজ্ঞেস করলেন, স্যার আপনি কি একা থাকবেন, না পাশের রুমে আপনার সাথীদের সঙ্গে থাকবেন? তিনি বললেন, আমাকে সাথীদের সঙ্গে রাখুন। তখন তাঁকে আমাদের কক্ষে স্থানান্তর করা হ'ল।

পরদিন দুপুরে হঠাৎ দেখি আমীরে জামা'আতের মেজ ছেলে আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীবকে সঙ্গে নিয়ে ওসি ছাহেব দরজার মুখে এসে হাযির। প্রিয়জনকে কাছে পেলে কত যে আনন্দ লাগে কারাজীবনে তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। আমাদের জন্য সে বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওসি ছাহেব বললেন, খাবার টেস্ট করতে হবে। তখন নাজীব বাটি থেকে

একটু খেল। তারপর আমাদেরকে সেটা দেওয়ার অনুমতি হ'ল। বলা বাহুল্য, জেলখানায় যাওয়ার পর গত ৩৫ দিনে এটাই ছিল প্রথম বাড়ীর খাবার। তেলাপিয়া মাছ দিয়ে কাঁচ কলার তরকারির সে তৃপ্তি ভুলবার নয়। সাথে মুরগী রান্না তো ছিলই।

খাবার সময় ওসি ছাহেব নিজ বাসা থেকে কাঁচের প্লেট ও গ্লাস নিয়ে আসেন। বাহির থেকে খাবার আনার অনুমতি দেন। তার আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ হ'লাম। সকালে সুইপার হিন্দু ছেলেটি এসে বলল, আপনারা কোনখানের মানুষ গো? আমার বাবা এখানে সুইপার ছিল। এখন মুই সুইপার। কিন্তু কখনো কোন এসপি-কে দেখিনি, রাত্রি ১২-টার পর এসে হারপিক নিয়ে নিজ হাতে টয়লেট-বাথরুম তদারকি করেন'। আমরা যাওয়ার আগেই হাজত কক্ষটির দেওয়াল চুনকাম করা হয়েছে। দেওয়ালের পানের পিক ও অন্যান্য ময়লা ছাফ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এসপি ছিলেন অতি ভদ্র মানুষ এবং আমীরে জামা'আতের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাশীল। এরপরে নওগাঁ পৌর এলাকা সভাপতি জালালুদ্দীন ভাই আমাদের জন্য রান্না খাবার নিয়ে এসেছেন।

পরদিন সকাল ১০-টায় রিম্যাণ্ড শুরু হয়। পোরশা থানার ব্রাক অফিসে ডাকাতি ও নওগাঁ রাণীনগর থানার খেজুর আলী হত্যা মামলার আসামী আমরা। আমাদের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি পরিচয় লেখার পর আমীরে জামা'আতকে উদ্দেশ্য করে জনাব ডিসি মহোদয় বললেন, স্যার আপনাদের বিষয়ে আমরা সবই জানি। আপনারা পরিস্থিতির শিকার। অতএব আমাদের কিছু নছীহত করুন! তখন আমীরে জামা'আত দরদভরা কণ্ঠে প্রায় আধা ঘণ্টা নছীহত করলেন। ডিসি ছাহেব সেগুলি টেপ করে নিয়ে চলে গেলেন। পরদিন এসে পুনরায় একই দাবী করলেন এবং বললেন, আমার স্ত্রী টেপ শুনে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। তিনি আজকে পুনরায় আপনার নছীহত শুনতে চেয়েছেন। তখন আমীরে জামা'আত আখেরাতে মুক্তি লাভের শর্তের উপর মর্মস্পর্শী ভাষায় উপদেশ দেন। অতঃপর বিদায়ের সময় ডিসি ছাহেব বলেন, স্যার আপনার থিসিস আমি পড়েছি। আমি একজন 'আহলেহাদীছ'। বাড়ী রাজশাহীর বিদিরপুরে। এ সময় তাঁর কণ্ঠ ছিল ভারাক্রান্ত।

এভাবে চারদিনের রিম্যাণ্ড শেষে ০১.০৪.০৫ইং শুক্রবার আমরা পুনরায় নওগাঁ যেলা কারাগারে ফিরে আসি।

(৮) জেলখানায় প্রথম 'দেখা' : পরের দিন সুবেদার ছাহেব খবর দিলেন আজ আপনাদের 'দেখা' এসেছে। 'দেখা' জেলখানার একটি প্রিয় শব্দ। কারণ এদিন বন্দীদের প্রিয় ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সাধারণতঃ ১৫ দিন পরপর আধা ঘণ্টার জন্য এই সুযোগ দেওয়া হয়। তবে কেন্দ্রীয় কারাগার সমূহে এই নিয়মের কিছু ব্যত্যয় ঘটে থাকে।

আমীরে জামা'আতের সাথে আমাদেরও 'দেখা' এসেছিল। ফলে আমরাও গেলাম। গিয়ে দেখি সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ড. মুছলেহুদ্দীন, আত-তাহরীক সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ আব্দুল লতীফ, নওদাপাড়া মাদরাসার কয়েকজন শিক্ষক, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ভাই আফযাল হোসায়েন, সেক্রেটারী শহীদুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, মেহেরপুর যেলা আন্দোলন-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ হাসানুল্লাহ, সেক্রেটারী আব্দুছ ছামাদ, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সভাপতি তরীকুযযামান সহ অনেক নেতা-কর্মী উপস্থিত আছেন। পৃথক পৃথক ছোট্ট জানালার ফাঁক দিয়ে সালাম বিনিময়ের পর ভীড়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হ'ল। সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম বললেন, স্যার আমরা পরামর্শক্রমে ড. মুছলেহুদ্দীন ভাইকে 'ভারপ্রাপ্ত আমীর' বানিয়েছি। আমীরে জামা'আত একটু থেমে থাকলেন। কেননা ইতিপূর্বে রাজশাহী জেলখানায় থাকতে প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. লোকমান হোসাইনকে ভারপ্রাপ্ত আমীর নিয়োগ দানের ব্যাপারে তিনি আমাদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। কিন্তু বাইরের পরিস্থিতি ভেবে তিনি মজলিসে শূরা-র এ সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেন এবং কিছু পরামর্শ দিলেন। যেমন গ্রামে-গঞ্জে সাংগঠনিক মযবূতী সৃষ্টির জন্য ব্যাপক দাওয়াতী সফর করা, পেপার-পত্রিকায় ও সর্বস্তরে আমাদের অবস্থান, সাংগঠনিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, চিন্তা ও দর্শন তুলে ধরা, নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য লেখালেখি করা এবং এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করা ও মিটিং-মিছিল করা ইত্যাদি।

অতঃপর আমাকে রিম্যাণ্ডের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, আল্লাহ্‌র রহমত যে, আমরা আমীরে জামা'আতের সাথে এ্যারেষ্ট হয়েছি। সকলকেই আল্লাহ সম্মানের সাথে রেখেছেন। তবে রিম্যাণ্ডে যেসব তথ্য নিয়ে

জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তা আমাদের ঘরের লোকেরই সরবরাহ করা। কেননা জেআইসিতে একটি লিখিত কাগজ দেখে দেখে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। যা নিশ্চিতভাবেই আমাদের বহিস্কৃত ব্যক্তিটির সরবরাহ করা তথ্য। ইতিমধ্যে আমাদের সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেল। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে সবাইকে বিদায় জানিয়ে আমরা আমাদের নির্ধারিত সেল কক্ষে ফিরে এলাম।

সিরাজগঞ্জের রিম্যাণ্ড :

আমাদের উপর চাপানো মিথ্যা মামলা সমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল আমার জন্মস্থান সিরাজগঞ্জ যেলার উল্লাপাড়া থানায় 'নেওয়ার গাছা' গ্রামীণ ব্যাংক শাখায় বোমা হামলার মামলা। ঐ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিরাজগঞ্জের পুলিশ সুপার কর্তৃক গঠিত ইন্টারোগেশন সেলে পরপর দু'বার তিন দিন করে ছ'দিন রিম্যাণ্ডে নেওয়া হয়। প্রথমবার ২৯ হ'তে ৩১শে মে ২০০৫ পর্যন্ত তিনদিন রিম্যাণ্ড হয়। সে মতে ২৮ তারিখ দুপুরের মধ্যেই আমাদেরকে সিরাজগঞ্জ যেলা কারাগারে পৌঁছানো হয়। স্যার এলেন একাকী গাইবান্ধা কারাগার থেকে এবং আমরা তিনজন গেলাম নওগাঁ কারাগার থেকে। পৌঁছলাম প্রায় একই সময়ে। কারা অফিসে ঢুকে ডেপুটি জেলার হিসাবে পেলাম আমীরে জামা'আতের এক ছাত্রকে। বাড়ী রাজশাহীর মোহনপুরে। অতঃপর যথারীতি কারাগারের সেলে নেওয়া হ'ল। রুমগুলি ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট। উপরন্তু নেই কোন ফ্যানের ব্যবস্থা। আমীরে জামা'আতকে পৃথক রুমে রাখা হ'ল। সকালে শুনলাম পানির পাইপ দিয়ে বড় এক গেছো ইঁদুর ঢুকে রাতভর ডিসটার্ব করেছে। যা পরদিনই সুবেদার ছাহেব লোক ডেকে এনে পাইপের মুখে স্টীলের নেট দিয়ে বন্ধ করে দেন।

সিরাজগঞ্জ আদালতে :

পরদিন আদালতে নেওয়া হ'ল। সেখানে এক নতুন অভিজ্ঞতা। আদালত ভবন ও প্রাঙ্গণ সিরাজগঞ্জ যেলা সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষে ঠাসা। কোর্ট হাজতে প্রবেশ করলাম। বিরাট রুম। অথচ একেবারেই ফাঁকা। আমাদের চারজনের জন্য একটা লম্বা ঠেস বেঞ্চ। আমাদের কেইস পার্টনার কম্পিউটার সায়েন্সের জনৈক ছাত্র। নাম গোলাম মুক্তাদির। নীচে বসে আছে। আমীরে জামা'আত তাকে বারবার আমাদের সাথে বেঞ্চে বসার জন্য বললেন।

কিন্তু ছেলেটি রাযী হ'ল না। পরে সে বলল, স্যার! আমি আপনাদের সাথে আসামী। আমি কয়েকবার এখানে হাযিরার জন্য এসেছি। কিন্তু আসামীদের ভিড়ে কখনো বসতেও জায়গা পাইনি। কিন্তু আজকে দৃশ্য সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। সব আসামীকে বারান্দায় লাইন দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। হাজতখানা ও টয়লেট চুনকাম করা হয়েছে। এখন বুঝলাম এসবই আপনাদের কারণে।

হঠাৎ আযীযুল্লাহ বলল, স্যার গেইটের দিকে চলুন। বলতেই তাকিয়ে দেখি একজন পুলিশ অফিসার স্যারের উদ্দেশ্যে স্যালুট ও সালাম দিচ্ছেন। আমরা সবাই এগিয়ে গেলাম। লোহার শিকের দরজার মাঝখান দিয়ে মুছাফাহা হ'ল। তিনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে নিজের পরিচয় দিলেন এডিশনাল এসপি ও রিম্যাণ্ডের প্রধান হিসাবে। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে কুশল বিনিময় শেষে তাঁর সাথীদের নিয়ে চলে গেলেন।

বেশ কিছু পরে আমাদেরকে আদালতের উদ্দেশ্যে বের করা হ'ল। কাউকে কাছে ভিড়তে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু মানুষ মানছে না। অশ্রু ছলছল নেত্রে সবাই সালাম করছে। ভীড়ের মধ্যে আমার বড় ভাই আমাকে একজোড়া স্যাণ্ডেল দিল। অতঃপর আদালত কক্ষে প্রবেশ করলাম। কিন্তু সেখানে দাঁড়ানোর জায়গা নেই। এমনকি আমাদের কাঠগড়াতেও উঠানো হ'ল না। আমাদের উকিল ও জজ-এর মধ্যে অল্পক্ষণ কথার পরেই আমাদেরকে পুলিশ বের করে আনল।

এবার পুলিশ ভ্যানে উঠার পালা। সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ছাড়াও শত শত মানুষের প্রচণ্ড ভীড় ঠেলে আস্তে আস্তে চলছি। অতঃপর ভ্যানে উঠছি। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এক ছড়া লিচু আমীরে জামা'আতের হাতে দিতে গেল। এটাই তার অপরাধ হ'ল। তখনই তাকে এ্যারেস্ট করা হ'ল। পরে তার নাম জেনেছি। তিনি সিরাজগঞ্জ বাজারে একটি ঔষধের দোকানের মালিক 'অপূর্ব'। আসল নাম আমীনুল ইসলাম। তার এই অন্যায় গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী সমিতি ফুঁসে ওঠে। ফলে দু'সপ্তাহ কারাগারে থেকে তিনি মুক্তি পান। এখন তিনি 'আন্দোলন'-এর সিরাজগঞ্জ যেলা কর্ম পরিষদের দফতর সম্পাদক (সেশন ২০১৫-১৭ইং)।

এবার আমাদেরকে ৩দিনের রিম্যাণ্ডে সরাসরি সদর থানায় নেওয়া হ'ল। কিন্তু কর্মীরা কেউ জানতে পারেনি আমাদের কোথায় নেওয়া হচ্ছে। ফলে আমীরে

জামা‘আতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও তার সাথীরা প্রথমে জামতৈল থানা অতঃপর উল্লাপাড়া থানায় চলে যায়। কিন্তু কোথাও না পেয়ে গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে তারা রাজশাহী ফিরে যায়। পরদিন আব্দুল লতীফ সদর থানায় গিয়ে আমাদের সন্ধান পায়। তার পরদিন ছাকিব ও সালাফী ছাহেবের ছোট ছেলে আব্দুল হামীদ সদর থানায় এসে সাক্ষাৎ করে।

এখানে আমাদেরকে পরিচ্ছন্ন মহিলা হাজত খানায় রাখা হয়। যেখানে কোন হাজতী ছিল না। এডিশনাল এসপি ছাহেব নিজ হাতে পানি ভরে বাথরুমে বালতি এনে রাখলেন। যিনি ছিলেন রিম্যাণ্ড কমিটির প্রধান। আমীরে জামা‘আত বিনয়ের সাথে তাকে বললেন, আপনি এটা কি করছেন? এটুকু আমরাই তো পারি। জবাবে তিনি বললেন, আমাকে একটু খিদমতের সুযোগ দিন। এই সৌভাগ্য আর কখনো হয়ত হবে না’। তাঁর এই ভদ্রতায় আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হ’লাম।

পরদিন যোহরের ছালাত শেষে আমরা বসে আছি। এমন সময় দেখি বারবার পুলিশ আসছে। আর আমাদেরকে সালাম দিয়ে দো‘আ চেয়ে চলে যাচ্ছে। একজন পুলিশ জানালার ধারে অপেক্ষা করছে কিছু জানার জন্য। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই কিছু বলবেন কি? তিনি বললেন, স্যার! আজকে মসজিদে এক কাণ্ড ঘটে গেছে। এডিশনাল এসপি ছাহেব ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন, থানা হাজতে ড. গালিব ও তাঁর তিনজন সাথী এসেছেন। তোমরা যদি দো‘আ নিতে চাও, তবে এখুনি গিয়ে সালাম দিয়ে দো‘আ চেয়ে এসো। এমন মানুষ তোমরা হয়ত আর কাছে পাবে না’। স্যার এজন্য আমরা আপনার নিকট দো‘আ নেওয়ার জন্য এবং এক নযর দেখার জন্য এখানে এসেছি। আপনারা আমাদের জন্য দো‘আ করবেন যেন ভাল হয়ে চলতে পারি’।

নওগাঁর ন্যায় এখানেও রিম্যাণ্ডে ডিসি ও এসপি মহোদয় অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেন। আমীরে জামা‘আত বানান ভুল বরদাশত করতে পারেন না। তিনি বললেন, টেপরেকর্ডার নিয়ে আসুন এবং আমার বক্তব্য রেকর্ড করুন। তাতে কর্তৃপক্ষ খুবই খুশী হ’লেন এবং সেটাই করা হ’ল। এক পর্যায়ে যেলা ডিবি পুলিশের প্রধান বললেন, আপনার সহকর্মী প্রফেসর, যিনি একটি আহলেহাদীছ সংগঠনের প্রধান, তার নিকটে তথ্য নিতে গেলে তিনি বলেন, ‘আমরা হ’লাম

উদার এবং উনি হ'লেন কট্টর'। ঐ সময় এই ধরনের মন্তব্য যে কত কঠিন ছিল, ভুক্তভোগী মাত্রই তা বুঝতে পারেন। আমীরে জামা'আত কথাটি সহজভাবে নিয়ে বললেন, বেশ। আপনি একজন মুসলমান। কিন্তু ইসলামের বিধান সমূহ তেমন মেনে চলেন না। আপনি সব ব্যাপারে শিথিলতা দেখান। কিন্তু আরেকজন ভাই ইসলামের বিধান সমূহ সঠিকভাবে মেনে চলেন এবং অন্যকে মেনে চলার দাওয়াত দেন। এখন আপনিই বিচার করুন কাকে আপনি 'উদার' বলবেন ও কাকে আপনি 'কট্টর' বলবেন'। জবাব শুনে উপস্থিত কর্মকর্তাগণ সবাই খুশী হ'লেন।

ঐদিন ডিবি কর্মকর্তার মুখে ঐ প্রফেসরের উপরোক্ত মন্তব্য শুনে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত ও বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ সে সময় চরমপন্থী জেএমবিদেরকে বাঁচিয়ে আমাদেরকে জঙ্গী প্রমাণের জন্য সরকারীভাবে সাধ্যমত চেষ্টা করা হচ্ছিল। অথচ একটি আহলেহাদীছ সংগঠনের নেতা এবং স্যারের কলিগ হয়েও তার কাছ থেকে সামান্যতম সহানুভূতিও আমরা পাইনি।

স্যার কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে মিশতেন না। যদিও তিনি সমিতির সদস্য চাঁদা দিতেন। তিনি সহকর্মীদের সাথে বলতেন, ক্ষমতার স্বার্থে দলাদলির রাজনীতি পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও রেষারেষি সৃষ্টি করে। তার চাইতে এটাই কি ভাল নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম তিনজন প্রফেসরের মধ্য থেকে মহামান্য চ্যান্সেলর একজনকে ভাইস চ্যান্সেলর মনোনীত করবেন। একইভাবে অনুষদ ও বিভাগীয় ছাত্র সংসদে শ্রেণী ও মেধা তালিকায় সর্বোচ্চদেরকে নিয়ে 'ছাত্র সংসদ' গঠন করা উত্তম নয় কি? এর ফলে শিক্ষক ও ছাত্রদের দলাদলির প্রচলিত নোংরা রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাবে। সবাই মেধাকে ও বড়-কে সম্মান করবে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। কিন্তু এ কথা সমর্থন করলেও মেনে নেওয়ার মত কাউকে পাওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ সে কারণেই 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি' স্যারের পক্ষে কোন বিবৃতি দেয়নি। কারণ তিনি 'সাদা' বা 'হলুদ' কোন দলের লেজুড় ছিলেন না। ফলে তাঁরা স্যারের মুক্তির দাবীতে রাবি শাখা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ছেলেদের নিয়ে যাওয়া বিবৃতিতে পর্যন্ত স্বাক্ষর করেননি। তাদেরকে ক্যাম্পাসে মিছিলও করতে দেননি। অথচ তখন ভিসি, রেজিস্ট্রার, শিক্ষক সমিতির সভাপতি, কলা অনুষদের ডীন এবং আরবী বিভাগের

চেয়ারম্যান সবাই ছিলেন 'আহলেহাদীছ'। ১৯৮০ সাল থেকে যাদের সঙ্গে স্যার একই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী করে আসছেন। বস্তুতঃ দুনিয়াবী স্বার্থ ও দলীয় সংকীর্ণতা এদের জ্ঞানের চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছে। সত্যকে স্পষ্টভাবে সত্য বলার সাহসহীন এই ধরনের উচ্চ শিক্ষিত মানুষগুলির প্রতি সত্যিই করুণা হয়।

বস্তুতঃ দলবাজি রাজনীতির কারণে সমাজের সর্বত্র যেমন পচন ধরেছে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এখন মেধার লালন ক্ষেত্র না হয়ে দলীয় কর্মীদের পুনর্বাসন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ফলে মেধাবীরা ক্রমেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র রাবি শাখার অন্তর্ভুক্ত ভূ-তত্ত্ব ও খনি বিদ্যা বিভাগের কর্মীদের প্রস্তাবক্রমে তৎকালীন সভাপতি প্রফেসর তাহের ছাহেব (পরে নিহত), তাঁর বিভাগে মেধা তালিকার ভিত্তিতে একবার ছাত্র সংসদ নির্বাচন করেন। যা সাধারণ ছাত্রদের নিকটে প্রশংসার সাথে গৃহীত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দলবাজ শিক্ষক ও ছাত্রনেতাদের কারণে উক্ত নীতি আর টিকেনি বলে ছাত্রদের মাধ্যমে জেনেছি।

এ সময় আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রদ্রোহ' মামলা দেওয়ার জন্য বামপন্থী পত্রিকাগুলিতে খুব লেখালেখি চলছিল। সেমতে নাটোর যেলার সাধুপাড়া জামে মসজিদ থেকে গ্রেফতারকৃত বারো জন জেএমবি সদস্যের বক্তব্যের সূত্র ধরে মামলা দায়ের করার জন্য ঢাকার 'দৈনিক জনকণ্ঠ' সহ বিভিন্ন পত্রিকায় চাপ সৃষ্টি করা হয়। তখন নাটোর সদর থানা থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত পটুয়াখালির জনৈক তরুণ পুলিশ কর্মকর্তা সিরাজগঞ্জ সদর থানায় আসেন। তিনি আমাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্যারের বক্তব্য সমূহ লিপিবদ্ধ করেন। শেষে বলেন, স্যার! আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। আপনার সুনাম-সুখ্যাতি সম্পর্কে আমার জানা আছে। পত্র-পত্রিকায় যা কিছুই লেখা হৌক না কেন জেনে-শুনে আপনার বিরুদ্ধে আমি কোন মিথ্যা রিপোর্ট করব না'। *আলহামদুলিল্লাহ* নাটোরে স্যারের বিরুদ্ধে কোন মামলা হয়নি।

এভাবে তিনদিন রিম্যাণ্ড শেষে আমাদের পুনরায় সিরাজগঞ্জ কারাগারে নেওয়া হয়। পরের দিন সকালে আমাদেরকে নওগাঁয় ও স্যারকে গাইবান্ধায় নেওয়ার

জন্য গেইটে আনা হয়। অতঃপর জেল গেইট পার হওয়ার সময় গেইট প্রহরী পুলিশটি আমাদের সালাম দিয়ে কেঁদে ফেলল। অল্প দূরে দাঁড়ানো মাইক্রোর পাশে এসে তাকিয়ে দেখি প্রবীণ পুলিশটির লম্বা দাড়ি ভিজে চোখের পানি পড়ছে। সালাফী ছাহেব বললেন, উনার বাড়ী চাপাই নবাবগঞ্জ। উনার ছেলে আমাদের মারকাযের ছাত্র। এদিন আমাদের প্রিয়জনদের দূর থেকে দেখেছি। কিন্তু ওরা কাছে আসতে পারেনি। এডিশনাল এসপি ছাহেব নিজেই এসেছেন আমাদের বিদায় দেওয়ার জন্য। তাঁর এই সৌজন্য আমরা কখনই ভুলতে পারব না।

সিরাজগঞ্জে ২য় বার রিম্যাণ্ড :

উল্লাপাড়া ব্যাংক ডাকাতি মামলায় সিরাজগঞ্জ থানায় পুনরায় তিন দিনের রিম্যাণ্ডে নেওয়া হয় ১০.০৬.০৫ইং তারিখে। এবারে আমীরে জামা'আত আমাাদের সাথে নওগাঁ থেকে সিরাজগঞ্জ যান। রাতে কারাগারে থেকে পরদিন আদালতে উঠালে জজ ছাহেব জিআরও-কে ধমক দিয়ে বললেন, আবার উনাদের এনেছেন কেন? তারপরেই আমরা ফিরে এলাম কারাগারে। এবার পৃথক নতুন সেলে।

জৈষ্ঠ্যের দুপুরে কনকনে কংক্রিটের গরম ছাদের নীচে রুমগুলো যেন আগুন হয়ে আছে। ফ্যান বিহীন রুমের ভিতর ঢুকলে মুহূর্তে জামা-কাপড় ঘামে ভিজে যায়। রাতের বেলা মাথার উপরে শত পাওয়ারের লাইট। সেই সাথে মশার উপদ্রব। সবকিছু সহ্য করেই তিনদিন থাকতে হ'ল। আমীরে জামা'আতকে পৃথক রুমে রাখা হ'ল। সকালে আমীরে জামা'আত বললেন, মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য বিছানার চাদরটা উঠিয়ে গায়ে দিয়েছি। তাতে গরমের উপরে গরম ভোগ করেছি। তবুও সান্ত্বনা। আল্লাহ্র পথেই কষ্ট করছি। তোমরাও ধৈর্য ধারণ কর।

এবারে রিম্যাণ্ড চলা অবস্থায় একদিন এএসপি ছাহেব টিভি অন করে দিয়ে আমাদেরকে লাইভ নিউজ দেখালেন। এক একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল একই খবর বিভিন্নভাবে প্রচার করেছে। ঐদিনের খবর হ'ল সিরাজগঞ্জ শহরে ৭জন সন্ত্রাসী পুলিশের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আরেকটি চ্যানেল বলছে ৩জন। আরেকটি বলছে ১জন। আরেকটি বলছে ৫জন বন্দী হয়ে হাজতে রয়েছে। তিনি বললেন, অথচ ১জন সশস্ত্র ক্যাডার ধরা পড়েছে। যে আপনাদের পাশের

হাজত কক্ষে রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এএসপি আব্দুস সোবহান ছাহেব তদন্তের জন্য নওদাপাড়া মারকাযে এসেছিলেন। অতঃপর তিনি সুন্দর রিপোর্ট দেন। চাকুরী থেকে অবসরের পরে তিনি ঢাকার উত্তরায় বাসা করেছেন। তার প্রতিবেশী রাবির ভাষা বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান (২০১৫ইং) বলেন যে, তার সঙ্গে দেখা হ'লেই তিনি আমীরে জামা'আতের খোঁজ-খবর নেন। প্রশংসামূলক বিভিন্ন কথা বলেন। তাঁকে সালাম দেন ও দো'আ চান।

রিম্যাণ্ডের শেষ দিন এডিশনাল এসপি শামসুল হুদা ছাহেব দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বললেন, স্যার! যে ধরা পড়েছে, সে সরকার দলীয় ক্যাডার। অতএব আমার স্ট্যাণ্ড রিলিজের অর্ডার হয়েছে। আমাকে কালই চলে যেতে হবে চুয়াডাঙ্গায়। দো'আ করবেন।

সিরাজগঞ্জ কারাগারে এসে স্যার জেলার ছাহেবের অনুমতি নিয়ে দিনের বেলায় সেলের বাইরে কাঁঠাল গাছের ছায়ার নীচে কংক্রিটের রাস্তার উপরে কম্বল বিছিয়ে আমাদের বসার ব্যবস্থা করলেন। এই সময় স্যার কারা লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে সিরাজগঞ্জের বৃটিশ বিরোধী বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী কীর্তিমান ইসলামী ব্যক্তিত্ব সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর (১৮৮০-১৯৩১ খ্রিঃ) প্রায় পৌনে পাঁচশ' পৃষ্ঠার বিরাট জীবনী গ্রন্থটি পড়ে শেষ করেন। মাঝে-মধ্যে সেখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আমাদের শুনাতেন। যেমন একদিন তিনি বললেন, বৃটিশের বিরুদ্ধে সিরাজী ছাহেবের লিখিত 'অনল প্রবাহ' কাব্যগ্রন্থটি বাযেয়াফ্ত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকার রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দেয় এবং হুলিয়া জারী করে। তিনি কলকাতার এক বস্তিতে দিনের বেলা মশারী টাঙিয়ে রোগী সেজে দিন-রাত পরিশ্রম করে চলেছেন সম্ভবতঃ তাঁর স্পেন বিজয় মহাকাব্য রচনাটি শেষ করার জন্য। এক ইংরেজ ব্যারিষ্টার তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, আমার কোন ফিস লাগবেনা। কেবল আদালতের বিভিন্ন খরচ মিটাতে দু'শ টাকা লাগবে। কিন্তু এই স্বাধীনতা সংগ্রামীকে মাত্র দু'শ টাকা দেওয়ার মত লোক সেদিন পাওয়া যায়নি। ফলে তাঁকে দু'বছর জেল খাটতে হয়।

সিরাজী ছাহেব প্রথম দিকে কংগ্রেস করতেন। পরে মুসলিম লীগে যোগ দেন। এই রাজনৈতিক মতবিরোধের জের ধরে খোদ সিরাজগঞ্জের লোকেরাই তাঁকে

সিরাজগঞ্জ আলিয়া মাদরাসার নিকটে সর্বসমক্ষে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে আহত করে। তাঁর উদ্যোগে সে সময় সিরাজগঞ্জে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নেতাদের নিয়ে বড় বড় রাজনৈতিক সমাবেশ হ'ত। নিজের কোন আয় ছিল না। অথচ কবি নজরুল ইসলাম অসুস্থ হ'লে তিনি মানুষের কাছ থেকে নিয়ে মানি অর্ডার যোগে কলিকাতায় নজরুলের ঠিকানায় টাকা পাঠাতেন। অবশেষে তিনি নিজে কঠিন অসুখে পড়লেন। পিঠে বিষাক্ত ফোঁড়ার অসহ্য যন্ত্রণা। চিকিৎসার পয়সা নেই। স্ত্রীকে বললেন, বাসায় কি কিছু আছে? দেখা গেল এক টাকা তিন আনা আছে। বললেন, ওটা ছাদাক্বা করে দাও। স্ত্রী বললেন, চলবে কিভাবে? উনি বললেন, সে দায়িত্ব আল্লাহ্র। বিকালেই ডাক পিয়ন এসে হাক-ডাক শুরু করে। দেখা গেল ৬১ টাকার মানি অর্ডার এসেছে।

তাঁর কঠিন অসুখের কথা জানতে পেরে কলিকাতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯৬২) সহ বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা এসেছেন। সবাই তাঁর জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন। রাতের বেলায় নববিবাহিত পুত্র আসাদুল্লাহ সিরাজীকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন এবং বললেন, শিশু অবস্থায় তুমি যেমন আমার বুকের মধ্যে থাকতে, তেমনিভাবে আজ আমার কাছে থাক। তুমি আমাকে জোরে জোরে সূরা রহমান শুনাবে। যাতে আমি জান্নাতের সুসংবাদ শুনতে শুনতে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যেতে পারি'। অতঃপর মাত্র ৫১ বছর বয়সে তিনি নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। উল্লেখ্য যে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় আসাদুল্লাহ সিরাজীকে মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করে। থানা থেকে কারাগারে যাওয়ার সময় আমরা সিরাজী ছাহেবের কবরের পাশ দিয়ে যেতাম। আর তাঁর জন্য দো'আ করতাম। বলা বাহুল্য, সিরাজগঞ্জ কারাগারে গিয়ে সিরাজী ছাহেবের জীবনীর সাথে পরিচিত হওয়াটাই ছিল আমীরে জামা'আতের ভাষায় একটা বড় অর্জন। আল্লাহ তাঁর গোনাহ-খাতা মাফ করুন ও জান্নাতুল ফেরদাঊস নছীব করুন- আমীন!

তিন দিনের রিম্যাণ্ড শেষে আমরা সিরাজগঞ্জ থেকে নওগাঁ কারাগারে এলাম। স্যার এবার কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকলেন। এসময় তিনি 'ইনসানে কামেল' বইটি লিখলেন। তিনি সারা দিন পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকতেন। বিশেষ করে আযীযুল্লাহ্র পিএইচ.ডি থিসিসের বিষয়বস্তু প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁর জীবনী প্রায় সাড়ে ছয়শো পৃষ্ঠার বইটি তিনি পড়ে শেষ করে ফেলেন। একদিন

তিনি এক মনে বই পড়ছিলেন। সুবেদার ছাহেব এসে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। প্রায় ১৫ মিনিট পর তিনি সালাম দিলে স্যার মাথা উঁচু করে তার সালামের জবাব দেন। সুবেদার ছাহেব সেদিন বিস্মিত হয়ে প্রশংসামূলক অনেক কথা বলেছিলেন। ঐ সময় মাসিক আত-তাহরীক আগস্ট'০৫ সংখ্যায় 'আমার আব্বুর মুক্তি চাই' শিরোনামে স্যারের কনিষ্ঠ পুত্র নওদাপাড়া মারকাযের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের একটি কবিতা বের হয়। যা পড়ে আমরা কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। সুবেদার ছাহেব বলেছিলেন, বাপ কা বেটা। রক্তের তেজ এগুলি'। ইতিপূর্বে এপ্রিল'০৫ সংখ্যায় আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অনার্স ২য় বর্ষের ছাত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব-এর 'আমার আব্বাকে কেন গ্রেফতার করা হ'ল!' শিরোনামে লেখাটি বের হয়। যা ঐ সময় দৈনিক ইনকিলাব ৪ঠা মার্চ'০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া আমাদের মুক্তির পক্ষে ড. সাখাওয়াত হোসাইন, শামসুল আলম, শিহাবুদ্দীন আহমাদ এবং অন্যান্যদের লিখিত প্রবন্ধ, কবিতা ও বক্তৃতা সমূহ কারাগারের জীবনে আমাদের জন্য সান্ত্বনার বস্তু ছিল।

১৭ই আগষ্ট দেশব্যাপী বোমা হামলা :

১৭ই আগষ্ট সকাল বেলা অন্য দিনের মত লকাপ খুললে আমরা ব্যায়াম ও গোসল শেষ করে নাশতা খাচ্ছি, এমন সময় পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠল। সেল তালাবদ্ধ করে দেওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ পর সুবেদার এসে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। গোটা দেশে ৬৩টি যেলায় এক যোগে বোমা ফাটিয়েছে। হতাহতের তেমন খবর পাওয়া যায়নি। তবে সারা দেশে আতংক বিরাজ করছে। জেলখানায় পাহারা যোরদার করা হয়েছে। আপনারা বের হবেন না। কখন যে কি হয়? কার ঘাড়ে দোষ যায়, বলা যায় না। বিকালের দিকে সুবেদার ছাহেব একটি লিফলেট এনে বললেন, 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' (জেএমবি) উক্ত বোমা ফাটানোর দায়িত্ব স্বীকার করেছে এবং ইতিমধ্যে দুই/একটি যেলায় তারা ধরা পড়েছে। তখন 'জেএমবি' শব্দটি ছিল আমাদের কাছে নূতন। আমরা বলাবলি করছিলাম, তারা কোন দল, তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি? সালাফী ছাহেব বললেন, মুহতারাম আমীরে জামা'আত আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশে উগ্র ইসলামপন্থী একটি দল

ইসলাম ধ্বংস করার জন্য তৈরী হচ্ছে। তাদের থেকে আপনারা সাবধান থাকুন। বোমা ফাটিয়েছে সেই দল। আমাদের নানা রকম মন্তব্য ও দুশ্চিন্তা করতে করতে দিন কেটে গেল।

পরের দিন সকাল বেলা সুবেদার ছাহেব একটি কাগজে নিম্নের কোটেশন লিখে আমাদের শুনিয়ে বললেন, বলুন তো কে লিখেছেন? কোথায় লিখেছেন? 'জিহাদের অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্ত গঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদের ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র। আযীযুল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, আমি পারব, মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বইয়ে *(২৭ পৃঃ)* উক্ত কথাগুলি লিখেছেন। সুবেদার ছাহেব হেসে বললেন, শাব্বাশ! আপনি 'ডক্টর' হ'তে পারবেন। আমীরে জামা'আতের এই লেখনীই আপনাদের মুক্তির পথ সহজ করবে *ইনশাআল্লাহ*।

আযীযুল্লাহ বলল, আমি আমীরে জামা'আতের লেখা আরো অনেক কথা শুনাতে পারি। যেমন তিনি বলেন, 'বর্তমানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু তরুণকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বাপ-মা, ঘর-বাড়ী, এমনকি লেখা-পড়া ছেড়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে ছাহাবীগণ লেখাপড়া না করেই যদি জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত পেতে পারেন, তবে আমরাও লেখাপড়া না করে জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করব। কি চমৎকার ধোঁকাবাজি! ইহূদী-খ্রিষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক, আর অশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা তাদের বোমার অসহায় খোরাক হউক- এটাই কি শত্রুদের উদ্দেশ্য নয়? *(ইক্বামতে দ্বীন ৩৯ পৃঃ)*।

সুবেদার ছাহেব বললেন, তাহ'লে আমীরে জামা'আতের এ ধরনের বক্তব্যগুলি এক জায়গায় করে প্রচার করা আপনাদের কর্তব্য। আমরা বললাম, আমাদের 'দেখা' আসলে পরামর্শ দেব।

একদিন সুবেদার ছাহেব এসে বললেন, আপনারা যে, জেএমবি নন, তার প্রমাণ সরকার পেয়ে গেছে। কারণ গোয়েন্দাদের হাতে একটি চিঠি ধরা পড়েছে, তাতে লেখা আছে, ড. গালিবকে যেখানে পাও, সেখানেই বাধা দাও। বাড়াবাড়ি করলে একদম বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ো। তিনি আমাদের প্রধান শত্রু'। চিঠিটি লেখা ছিল আরবীতে। সুবেদার ছাহেব বললেন, আমার ধারণা আপনারা অতি দ্রুত ছাড়া পাবেন। আমরা বললাম, আল্লাহ আপনার মুখের কথা কবুল করুন! পরে আরবী লিফলেটটি আমাদের পড়ানো হয়।

ছদরুল আনাম গ্রেফতার :

৩১শে আগস্টের পত্রিকায় স্যারের ভাগিনা ছদরুল আনাম-এর গ্রেফতারের খবর পড়ে স্যার খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত হন। ৩০শে আগস্ট'০৫ মঙ্গলবার বেলা ১১-টার দিকে চট্টগ্রামে তার বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আমরা সবাই তার জন্য প্রাণভরে দো'আ করি। তিনি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর চট্টগ্রাম যেলা সভাপতি। পরে জেনেছি, তার বিরুদ্ধে ৬টি মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। সবগুলি প্রাথমিক তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় তিনি এফআরটি পান এবং সবশেষ একটিতে চূড়ান্ত বিচারে তিনি বেকসুর খালাস পান এবং ২ বছর ৩ মাস ২০ দিন কারাভোগের পর ২০.১২.০৭ইং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঈদুল আযহার এক দিন পূর্বে তিনি চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

স্যার বাদে আমাদের সকল কর্মীদের মধ্যে তিনিই সবচাইতে বেশী দিন কারা যন্ত্রণা ভোগ করেন। আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে এর উত্তম বদলা দান করুন- আমীন!

স্যার এসময় তার জন্য বিশেষভাবে দো'আ করতেন। যেমনটি মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারূনের জন্য করতেন। আল্লাহ বলেন, قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ 'মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি শুধু নিজের উপর ও আমার ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি। অতএব তুমি আমাদের উভয়ের ও এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়ছালা করে দাও' *(মায়েদাহ ৫/২৫)*। স্যার ভাই-এর স্থলে, وَابْنَ اُخْتِىْ ('আমার

ভাগিনা') বলতেন। তিনি আমাদের সঙ্গে দুঃখ করতেন এরূপ নিরীহ নির্দোষ ছেলেকে যারা কষ্ট দিচ্ছে, আল্লাহ তাদের কখনই ছাড়বেন না।

ভাগিনার বর্ণনা :

ভাগিনা ছদরুল আনাম ছিলেন আমীরে জামা'আতের সহোদর বড় বোনের বড় ছেলে। তিনি চট্টগ্রাম টিএসপি সার কারখানায় ১৯৭৮ সাল থেকে দীর্ঘ দিন যাবৎ কর্মরত। আমীরে জামা'আত যখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে চট্টগ্রাম যেতেন, তখন ভাগিনার বাসায় থাকতেন। ভাগিনা যেহেতু চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ছিলেন, সেকারণ স্যার গেলেই কর্মীদের নিয়ে তার বাসায় বৈঠক করতেন। সেই সূত্রে ভাগিনাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার বিরুদ্ধে ৬টি মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। কারামুক্তির অনেক পরে মামা-ভাগ্নে সাক্ষাতে গাড়ীর মধ্যে ভাগিনা বলেন, আমাকে প্রথমে যে টর্চার সেলে নেওয়া হয়, সেই কক্ষে তখন একজনকে দু'পা বেঁধে ছাদের সিলিংয়ে ঝুলিয়ে পিটানো হচ্ছিল। পাশের রুম থেকেও নির্যাতনের শব্দ ও চিৎকার ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। পুলিশ অফিসার আমাকে তার সামনে চেয়ারে বসিয়ে যবানবন্দী রেকর্ড করছিলেন। এমতাবস্থায় অন্য একজন অফিসার এসে বলেন, আরামে বসিয়ে কি রিম্যাণ্ড হয়? বলেই তিনি হাতের বেত উঁচিয়ে আমাকে মারতে উদ্যত হ'লেন। কিন্তু আমার শরীরে লাগার আগেই তিনি থেমে গেলেন। এই একটি ঘটনা ছাড়া দীর্ঘ কারাজীবনে আর কোনদিন আমার প্রতি সামান্যতম অসম্মান সূচক আচরণ করা হয়নি। এখন বুঝছি, এসবই ছিল মামুজীর দো'আর বরকত'।

আমীরে জামা'আত প্রায়ই বলতেন, আমাদের কারাবন্দী প্রায় ৪০ জন নেতা-কর্মীর সকলের মুক্তির পরেই যেন আমার মুক্তি হয়। আল্লাহ সেটাই কবুল করেন এবং তিনি মুক্তি পান সবার শেষে ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন পর ২০০৮ সালের ২৮শে আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বগুড়া যেলা কারাগার থেকে।

হাইকোর্টে যামিন হ'ল না :

নওগাঁ জেলের সুবেদার ছাহেব ১লা সেপ্টেম্বর'০৫ বৃহস্পতিবার এসে স্যারকে বললেন, আজকের পত্রিকায় দেখলাম আপনার যামিন হয়েও হ'ল না। জ্যেষ্ঠ বিচারক আপনাকে যামিন দিয়েছিলেন। দু'দিন পরে এসে কনিষ্ঠ বিচারক

ভিন্নমত পোষণ করেন। ফলে দ্বিধাবিভক্ত রায়ের কারণে যামিন হ'ল না। কথাগুলি শুনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হ'লাম। যেখানে চোর-দস্যুরা যামিন পায়, সেখানে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রফেসর' যামিন পান না, এটা কেমন হাইকোর্ট? কে না জানে যে, কনিষ্ঠ বিচারক সর্বদা সরকারের স্বার্থ দেখে থাকেন। হ্যাঁ, সেদিনকার সেই যামিন না হওয়ার খেসারত স্যারকে দিতে হ'ল পরবর্তী ৩ বছর কারা নির্যাতন ভোগের মাধ্যমে। কি চমৎকার বিচার বিভাগ! কি চমৎকার গণতন্ত্র ও মানবাধিকার!

এসময় স্যারকে 'ডিভিশন' নেওয়ার জন্য আমরা পরামর্শ দেই। তিনি বললেন, সেটা নিলে তো তোমাদের ছেড়ে একাই থাকতে হবে। তার চাইতে যেভাবে আছি, এটাই কি ভাল নয়? তখন তিনি বা আমরা কেউই জানতাম না যে, স্যারকে আমাদের থেকে সত্বর অন্য কারাগারে স্থানান্তরিত করা হবে। স্যার বললেন, এসব আবেদন করে কোন লাভ হবে না। কারণ যে দেশের হাইকোর্ট আমাকে যামিন দেয়নি, সে দেশের কোন আদালত আমাকে 'ডিভিশন' দিবে না।

স্মর্তব্য যে, উচ্চশিক্ষিত এবং সমাজের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কারাগারে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পান ও তাদেরকে কারাগারের ভাষায় 'ডিভিশন' দেওয়া হয়। যেখানে তাদের কিছুটা উন্নতমানের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাদেরকে দৈনিক পত্রিকা পাঠের সুযোগ দেওয়া হয়। এ নিয়ম বৃটিশ আমল থেকে চলে আসছে। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে এটার নিরপেক্ষ প্রয়োগ নেই।

আমীরে জামা'আত ৭টি জেলখানায় :

উল্লেখ্য যে, আমরা একটানা নওগাঁ জেলে থাকলেও আমীরে জামা'আতের মামলা ছিল বিভিন্ন যেলায়। ফলে তাঁকে প্রতিটি মামলার হাযিরার দিন সেখানে চলে যেতে হ'ত। এভাবে তাঁকে রাজশাহী, বগুড়া, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ ও ঢাকা সহ মোট ৭টি জেলখানায় নেওয়া হয়। তাঁকে স্থির হয়ে এক জায়গায় বেশী দিন থাকতে দেওয়া হ'ত না। এমনকি তাকে আগে কিছু বলা হ'ত না। বরং অন্য জেলখানায় নেওয়ার কিছু আগে হঠাৎ এসে বলা হ'ত 'প্রস্তুত হন'। জানিনা এটাও তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সরকারের অন্যতম ষড়যন্ত্র ছিল কি-না। তবে শেষের দিকে তাঁকে বগুড়া যেলা কারাগারেই অধিক সময় রাখা হয় এবং সেখান থেকেই তিনি বের হন।

ফাঁসির আসামী মোসলেম মোল্লা :

আমীরে জামা'আত নওগাঁ জেলে আসার কিছুদিন পর পূর্ব পার্শ্বের ১টি কক্ষে আনা হয় নওগাঁর হাসাইগাড়ি গ্রামের মোসলেম মোল্লাকে। এই বৃদ্ধ লোকটি বিনা দোষে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত। অতীব গরীব মানুষ। ঘরে তার দু'টি কন্যা সন্তান। রোজগারের একমাত্র উপায় ছিল ফেরী নৌকায় লোক পারাপার।

তিনি জানালেন, একদিন সন্ধ্যায় তিনি নদীর ঘাটে নৌকা নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় তিন জন লোক এসে তার নৌকায় পার হয়। নৌকা থেকে নামার সময় তারা বলল, বাবাজী! আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব। যদি দয়া করে এখানে অপেক্ষা করেন, তাহ'লে উপকৃত হব। আমরা আপনাকে পুষিয়ে দেব। তাদের আবদার রক্ষার্থে আমি থাকলাম। তারাও ফিরে এসে পার হ'ল এবং আমাকে ৫০০ টাকা দিয়ে খুশী করে চলে গেল। পাঁচ বছর পর আমি ছোট মেয়েটিকে সাথে নিয়ে বাজারে গিয়েছি। এমন সময় চৌকিদার এসে বলল, বাবাজী! বড় বাবু আপনাকে দেখা করতে বলেছেন। আমি সরল মনে থানায় গেলাম। তারপর তিনি আমার নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করে কাগজ-পত্র ঠিকঠাক করে আমাকে গ্রেফতার করলেন। পরদিন আদালত হয়ে জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। রাস্তায় শুনলাম ঐযে পাঁচ বছর পূর্বে সন্ধ্যায় তিন জনকে পার করেছিলাম, ওরা নাকি ঐদিন আমার নৌকায় পার হয়ে নিতাইপুর গ্রামের একজনকে জবাই করে হত্যা করেছিল। তাদের তিন জন সহ আমার নামে পলাতক আসামী হিসাবে ফাঁসির রায় হয়েছে। তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমাকে পেয়েছে। তাই...। কথাগুলি বলতে বলতে লোকটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। আমরা সান্ত্বনা দিলাম। কিন্তু এসব ঘটনা শুনে আমি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লাম। বুঝলাম, এদেশে বিচার বলতে কিছু নেই।

এমন সময় সুবেদার গোলাম হোসেন এসে বললেন, কি হয়েছে? আমি ক্ষোভের সাথে বললাম, এসব কি? বিনা দোষে ফাঁসি? উনি বললেন, স্যার! এসব বলতে নেই। চুপচাপ থাকাই জেলখানার নিয়ম। আমরা বিচারের মালিক নই। আশ্রয়দাতা মাত্র। আমি বিষণ্ন মনে কক্ষে শুয়ে নানা ভাবনায় ডুবে গেলাম। কয়েক মাস পরে জেলখানা বিষয়ে আমি নিম্নোক্ত কবিতাটি লিখলাম।-

হে মোহিনী জেলখানা
তোমাকে অনেক লেখার ছিল
অব্যক্ত বহু কথাও ছিল
কিন্তু কইতে রয়েছে মানা!
দুর্ভেদ্য প্রাচীরে নির্দোষ জীবন
মৃত্যুর আগেই দণ্ডেতে মরণ
প্রাণ রাখা কি যে যন্ত্রণা
কিন্তু কইতে রয়েছে মানা!
রাজনীতির ঐ নোংরা ফাঁদে
কত যে জীবন হতাশায় কাঁদে
বুকে চাপা দারুণ বেদনা
কিন্তু কইতে রয়েছে মানা!
গণতন্ত্রের প্রহসনে
আটক রয়েছে বহু বিজ্ঞ জনে,
মুক্তির আশে করছে দিন গণনা।
কিন্তু কইতে রয়েছে মানা ॥
বহাল রাখতে রাজার গদি
বইয়ে দিচ্ছে রক্তের নদী
ঝরে যায় কত অচেনা প্রাণ,
কিন্তু কইতে রয়েছে মানা।
খুন-খারাবী রাহাযানী
যত করুক হানাহানি
তুমি যে তার শেষ ঠিকানা।
কিন্তু কইতে রয়েছে মানা ॥
নানা বর্ণের নানা ধর্মের

নানা চিন্তার লোক,
রাজা-প্রজা, শত্রু-মিত্র
যে যাই হোক।
কেউ নির্দোষ কেউ বা দোষী
কেউ গুণী বা নির্গুণ
সবাইকে তুমি দিয়েছ আশ্রয়
নিবারণে হানাহানি।
থাকার জায়গা পাশাপাশি হ'লেও
মেয়াদ সবার এক নয়।
কেউ আছে দশ-বিশ বছর
কেউ আছে দিন কয়।
কত যে দোষী মুক্তি পেয়ে
করছে অট্টহাসি,
কত যে নির্দোষ
ধুঁকে ধুঁকে মরে
এই বদ্ধ কুঠরী মাঝে।
একই কম্বল, থালা ও বাটি
একই খাবার একই মান,
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মোদের
সবাই মোরা এক আদমের সন্তান।
এক সাথে সবার লকাপ খোলা
এক সাথে বন্দী গণনা,
দুনিয়ায় যতই ছোট বড় থাক
কবর মোদের একক ঠিকানা ॥

মোসলেম মোল্লা বেকসুর খালাস :

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের কারাগারে আগমনে নওগাঁ জেলখানার হাজতী, কয়েদী এমনকি কারারক্ষীরাও রাগে-দুঃখে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। কান্না জড়িত কণ্ঠে তাদের অনেকের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে যে, এ সরকারের পতন আসন্ন। নির্দোষ আলেমের হৃদয়ের আকুতি ও মযলূমদের চোখের অশ্রু বৃথা যেতে পারে না। তবে কয়েদীরা আমীরে জামা'আতকে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিল এই ভেবে যে, তারা তাদের মনের গহীনে জমানো অনেক কথা আমীরে জামা'আতকে বলে মানসিকভাবে স্বস্তি পাবে এবং তাঁর কাছ থেকে দো'আ নিতে পারবে। এই ধরনের একজন ছিলেন নওগাঁর হাসাইগাড়ীর মোসলেম মোল্লা। যার সম্পর্কে উপরে বলা হয়েছে। যিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে আয়োজিত মিছিলে যোগদান করেছিলেন। তিনি তার সমস্ত ঘটনা খুলে বললে আমীরে জামা'আত তাকে জেল আপীল করার পরামর্শ দেন এবং তার মুক্তির জন্য প্রাণখোলা দো'আ করেন। ফলে আল্লাহ্র রহমতে আমরা জেলখানায় থাকতেই হাইকোর্ট থেকে তার মুক্তির কাগজ-পত্র কারাগারে এসে পৌঁছে যায়। মুহূর্তের মধ্যে তার নির্দোষিতার খবর সারা জেলখানায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন আমীরে জামা'আতের দো'আ নেওয়ার জন্য নির্দোষ অনেকেই ভীড় করতে থাকে। এমনকি কর্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে আমাদের সেলে কাজ করার অনুমোদন নিত। ঠিক তেমনি একজন নির্দোষ কয়েদী ছিল মুন্সী আবেদ আলী ও তার ভাতীজা সুরমান।

আবেদ আলী মুন্সীর মুক্তি লাভ :

সুরমান কয়েদীর বয়স প্রায় ২০ বছর। আমাদের থালা-বাটিগুলি খুব যত্ন সহকারে পরিষ্কার করত। কাজের ফাঁকে তাকে জেলখানায় আসার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, স্যার আমি ও আমার চাচা নির্দোষ। পরের উপকার করতে গিয়ে এখন আমরা জেলখানায়। এরপর সে তাদের ঘটনা বলতে লাগল যে, 'আমার বাড়ীর পাশেই একটি বিবাহ অনুষ্ঠান চলছিল। পিতার অনুমতি ছাড়াই ১৫ বছরের একটি মেয়ের বিয়ে হচ্ছে তার চাচার

বাড়ীতে। কোন ইমাম বিয়ে পড়াতে রাযী হচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে একজন ছালাত পড়ত। সে বিয়ে পড়িয়ে দিল। কিন্তু নাম দিল আমার চাচা আবেদ আলী মুন্সীর। বিবাহ শেষ। তারা সুন্দরভাবে সংসার-ধর্ম করছে। কোন বাক-বিতণ্ডা বা ঝক্কি-ঝামেলা নেই। মাসখানেক পরে শুনলাম, অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েকে জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়া হয়েছে এই মর্মে মেয়ের বাবা বিয়ে পড়ানো ইমাম, ইমামের ছেলে, বর ও কণে পক্ষের সাক্ষী সহ মোট ৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে। পরে যামিন নিয়ে এক বছর কেইস চলার পর রায়ে ইমাম ও বরের ১০ বছর এবং আমাদের ৭ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। রায়ের আগে আমার চাচা ইমাম ছাহেব হাত জোড় করে অশ্রুসজল চোখে মিনতি করলেন যে, বাবা আমি কিছুই জানি না। ওরা আমার নাম দিয়েছে মাত্র। কিন্তু আদালত সেদিকে কর্ণপাত করেনি। ঘটনা বলতে বলতেই ইমাম আবেদ আলী মুন্সী এসে হাযির। আমীরে জামা'আতের হাতে মুছাফাহা করে বললেন, স্যার বিনা দোষে তিন বছর জেল খাটছি। আপিল করেছি। সম্ভবতঃ এ মাসেই রায় হবে। দো'আ করবেন, যাতে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন। সত্তুরোর্ধ বয়সের পরহেযগার মুন্সী আবেদ আলীর কান্না দেখে আমরা চোখের পানি ধরে রাখতে পারছিলাম না। আমীরে জামা'আত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে দো'আ করলেন। অতঃপর আমরা জেলখানায় থাকা অবস্থাতেই তিনি নির্দোষ সাব্যস্ত হয়ে মুক্তি পান।

আমীরে জামা'আতের বৃক্ষ রোপণ :

কালের আবর্তে আমাদের বন্দী জীবনের মেয়াদ বৃদ্ধি পেতে থাকল। ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল, মে গত হয়ে জুন মাস এল। অবিরতভাবে ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বললেন, 'ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ' হিসাবে আমাদের ওয়ার্ডে কিছু গাছ ও ফুলের চারা রোপণ করব। সুবেদার ছাহেব আসলে আমীরে জামা'আত তার নিকট প্রস্তাব দিলেন, যদি কিছু ফুল ও ফলজ গাছের চারা এনে দেন, তাহ'লে আমরা তা এখানে রোপণ করতে চাই। তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন। আমীরে জামা'আত নিজ হাতে সেখানে হাস্নাহেনা ফুলের গাছ, রকমারি টাইম ফুল, গাঁদা ফুল ও সঊদী খেজুরের বীচি রোপণ করলেন। তাঁর সঙ্গে মিলে আমরা প্রতিদিন বিকালে এগুলির পরিচর্যা করতাম। জেল থেকে বের হওয়ার অনেক পরে একজন পরিচিত কারারক্ষীর সঙ্গে দেখা

হ'লে তিনি জানালেন যে, আমীরে জামা'আতের লাগানো ফুলের বাগান আজও আছে এবং সেই খেজুর গাছে ফল ধরেছে। ঐ গাছগুলি দেখলেই আমাদের মনে আমীরে জামা'আতের কথা ভেসে ওঠে। তাঁর খোলা-মেলা ও সহজ-সরল আচরণ আমাদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর শিক্ষা ও দো'আ আমাদের ইহকালের ও পরকালের পাথেয় হবে *ইনশাআল্লাহ*।

পরে জেনেছি, বগুড়া জেলখানায় গিয়েও তিনি তাঁর ফাঁসির সেলের আঙ্গিনায় ফুলবাগান করেন। তাঁর ২য় পুত্র নাজীবকে দিয়ে রাজশাহী থেকে কাগজী লেবুর কলম ও অন্যান্য ফুলের গাছ কিনে এনে লাগান। কয়েদী খাদেমদের মাধ্যমে জেলখানার আদম সার ও গোবর সার এনে নিজ হাতে বাগান পরিচর্যা করতেন। একদিন সুপার ও জেলার ছাহেব তাঁর এই কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে তিনি বলেন, সরকার যদি আমাকে ফাঁসি না দিয়ে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেয়, তাহ'লে আপনারা আমাকে ফুল বাগান পরিচর্যার কাজ দিবেন'। তিনি সেখানে পাথরকুচির গাছ লাগান। যাতে তার পাতা খাইয়ে আমাশয়ের রোগী বন্দীদের সুস্থ করতে পারেন। প্রতি রাতে ডিউটিতে আসা কারারক্ষীরা বলত, আমরা সেলে ডিউটি নিতে চাই স্যারের উপদেশ শোনার জন্য এবং তাঁর লাগানো হাস্নাহেনা ও রজনীগন্ধা ফুলের ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য। শেষদিকে তিনি 'ডিভিশন' পেলে সেখানেও হাস্নাহেনা ও কামিনী ফুলের গাছ লাগান ও সঊদী খেজুরের বীচি রোপণ করেন। উল্লেখ্য যে, জেলখানার খাদেমদের 'ফালতু' বলা হয়। অথচ এদেরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

এক রজনীর উপহার 'ইনসানে কামেল' :

মুহতারাম আমীরে জামা'আত একদিন বিকালে আমাকে ডাকলেন। সে সময় আমরা সেলের আঙিনায় হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। তিনি বললেন, 'নূরুল ইসলাম! সরকারের যে মতিগতি, তাতে আমাদের সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না। অতএব কর্মী, শুভাকাংখী ও সাধারণ সমর্থকদের প্রতি আমাদের কিছু নছীহত থাকা দরকার। আমি স্যারের কথা সমর্থন করে বললাম, আমাদের নেতা-কর্মীদের কার্যকর দিক-নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই লকআপ-এর ঘণ্টা পড়ে গেছে। ফলে আমীরে জামা'আতের রাতের খাবার তাঁর কক্ষে ঢেকে রেখে আমরা তিনজন পাশেই আমাদের রুমে চলে গেলাম।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আত নওগাঁ জেলখানায় আসার পর তিনি সহ আমরা চারজন প্রথম কয়েকদিন এক রুমেই ছিলাম। পরে আমাদের ইবাদত ও আমলের হাল-অবস্থা দেখে উনি তাঁর জন্য বরাদ্দকৃত পাশের রুমে চলে গেলেন। দিনের খাবার ও ছালাত এক সঙ্গে হ'ত। তারপর সন্ধ্যায় আমরা যার যার রুমে চলে যেতাম। সেদিনও তাই হ'ল। ফজরের ছালাতের পর লকআপ খুললে স্যারের রুমে গিয়ে দেখি রাতের খাবার যেভাবে ঢেকে রেখেছিলাম সেভাবেই আছে। বললাম, স্যার একি অবস্থা? বললেন, খাওয়ার কথা মনেই নেই। তোমরা শোন, এই আমার নছীহত। নছীহতনামাটি আযীযুল্লাহ পড়তে লাগল, আমরা শুনলাম। স্যার মাঝে-মধ্যে বুঝিয়ে দিলেন। কি চমৎকার উপদেশমালা! **'ইনসানে কামেল'** নামে এক রাতেই শেষ করা তাঁর এই লেখাটিকে আমরা আল্লাহ্‌র রহমত হিসাবে গ্রহণ করলাম। স্যার বললেন, লেখাটি খুব সাবধানে মারকাযে পাঠানোর ব্যবস্থা কর। ওরা রেফারেন্সগুলো দিয়ে দিবে।

পরে লেখাটি 'আত-তাহরীক' ৯ম বর্ষ অক্টোবর ও নভেম্বর'০৫ পরপর দু'সংখ্যায় বের হয়। আরও পরে ২০০৯ সালের জানুয়ারীতে সেটি ৩২ পৃষ্ঠার বই আকারে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশ করে। উক্ত লেখাটি পাঠানোর পর আমীরে জামা'আত **'আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল : শিকড়ের সন্ধানে'** নামক আর একটি বৃহৎ প্রবন্ধ লেখেন। যা 'আত-তাহরীক' ৯ম বর্ষ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী'০৬ যুগ্ম সংখ্যা এবং মার্চ ও এপ্রিল'০৬ পরপর তিন সংখ্যায় বের হয়। একইভাবে তিনি বগুড়া কারাগারে বসে লিখেছিলেন **'ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা'** এবং **'আহলেহাদীছ-এর নিদর্শন'** সহ ৭টি দরস। যা মাসিক 'আত-তাহরীক' ১০ম বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় বের হয়। যেগুলি ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। এভাবে তিনি কারাগারে বসেও খুবই রিস্ক নিয়ে 'আত-তাহরীক'-এর জন্য মাঝে-মধ্যে লেখা পাঠাতেন।

মজীদ ডাকাত :

নওগাঁ জেলখানায় আমাদের পাশের সেলে ছিল ফাঁসির আসামী আব্দুল মজীদ ডাকাত। খুব উচ্চৈঃস্বরে যিকর করত। আবার পুলিশদের গালি-গালাজ করত। সুবেদারের নিকট জানলাম সে একজন কুখ্যাত ডাকাত। তার সাথে

সাক্ষাৎ করার আগ্রহ প্রকাশ করলে সুবেদার অনুমতি দিলেন। আব্দুল মজীদ ফাঁসির আসামী। তাই দিনরাত ২৪ ঘণ্টা সেলের মধ্যে বন্দী থাকে। শুধু খাবার দেওয়ার সময় ছোট গেইট খুলে সতর্কতার সাথে পুলিশের সাহায্যে খাবার দেওয়া হয়। একদিন তার সেলের গেইটে রড ধরে দাঁড়িয়ে তার সাথে যে কথোপকথন হয়েছিল তা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

ভাই আপনার নাম কি? মুহাম্মাদ আব্দুল মজীদ। ঠিকানা কি? বদলগাছী থানা সদরে, শেখপাড়া। পেশা কি? ডাকাতি। বললাম, ডাকাতরা কি নিজেদের ডাকাত বলে পরিচয় দেয়? সে বলল, যারা নিজের পেশাকে গোপন রাখে, তারা তো চোর। চুরি তো নিকৃষ্ট পেশা। চোরেরা তো ধনী-দরিদ্র, ফকীর-মিসকীন, অসহায় সবার কাছ থেকেই সুযোগ পেলে চুরি করে। এই দেখেন, আমরা বন্দী, অসহায়। আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত আটা, চাল, তেল, লবণ, সাবান, সোডা, যা দিয়ে কোন মতে জীবন বাঁচানো যায়, সেই বরাদ্দকৃত জিনিস থেকেও যারা চুরি করে তারা কত নিকৃষ্ট চোর। এজন্যই আল্লাহ ওদের হাত কেটে দিতে বলেছেন।

কোন কেইসে আপনার ফাঁসির রায় হয়েছে? সে বলল, আমি শুনেছি আপনারা ভদ্রলোক, খাঁটি আল্লাহভীরু, কলেজের অধ্যাপক। তাই আপনাদের কাছে আমার মনের কথাগুলি খুলে বলি। যদি কোন দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। শুনুন! আমি বাপের একমাত্র ছেলে। এইচএসসি পাশ করে রাজনৈতিক কারণে আর লেখাপড়া করতে পারিনি। আমার আলীশান বাড়ী আর দরায কণ্ঠ দেখে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয় দলের মিছিলে আমাকে ডাকা হ'ত। আমাকে সামনে দিয়ে নেতারা পিছনে থাকতো। শ্লোগান সবসময় আমাকেই দিতে হ'ত। সেদিন জাতীয় এক নেতার জন্মদিবস এবং আরেক নেতার মৃত্যু দিবসে দুই দল থেকে ডাক পড়লে আমি জন্ম দিবসের আনন্দ মিছিলে (অর্থাৎ বিএনপির মিছিলে) যোগ দেই এবং শ্লোগান দিতে থাকি। হঠাৎ আড়াল থেকে গুলি এসে আমার পাশের দুই তরুণের বক্ষ ভেদ করে। অতঃপর গুলি এসে আমার হাতে লাগে। আমরা রাস্তায় লুটিয়ে পড়লাম। আর নেতারা পালিয়ে গেল। পরে হাসপাতাল থেকে শুনলাম যে, নেতারা আমার চিকিৎসা ও নিহত তরুণ দুই ভাইয়ের দাফন-কাফনের জন্য উপর থেকে অর্থ এনে নিজেরা আত্মসাৎ করেছে।

আমি এক নেতার ছাত্রাবাসে গিয়ে আমার চিকিৎসার খরচ চাইলাম। সে আমার দিকে চোখ পাকিয়ে অস্ত্র উঠালো। আমি আত্মরক্ষার্থে তার হাত চেপে ধরে পা দিয়ে জোরে ওর পেটে লাথি মারতেই সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। তারপর আমি সেখান থেকে চলে আসি। ছুটির দিন ছাত্রাবাসে কেউ ছিল না। সময় ছিল রাত ৮-টা। পরের দিন সকালে ঘোষণা হ'ল সন্ত্রাসীরা তাহেরকে হত্যা করেছে। এই হ'ল আমার অপরাধ জগতে আসার ইতিহাস। শুরু হ'ল আমার জীবনে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম। এভাবে আমার জীবনে শতাধিক বড় মাপের ঘটনা ঘটেছে। কোনটাতেই জেল-জরিমানা হয়নি। একটি মিথ্যা মামলায় আমার ফাঁসির রায় হয়েছে। এখানে বসেই বাইরে আমি আমার গ্যাং পরিচালনা করি ও পরিবার পালন করি। প্রশাসনের লোকেরা আমাকে ভয় পায়। তাছাড়া আমার কাছ থেকে তারা অনেক কাজ নেয়।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি উচ্চৈঃস্বরে যিকর করেন কেন? সে বলল, মিথ্যা মামলায় ফাঁসির রায়ের পর আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আল্লাহ্র বিচার সঠিক ও নির্ভুল। অনেক মার্ডার কেইসে আমি খালাস পেয়ে গেছি। যেখানে ফাঁসি হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তা না হয়ে হ'ল মিথ্যা কেইসে ফাঁসি। এটাই হ'ল আল্লাহ্র বিচার। পাপ করলে দুনিয়া ও আখেরাতে তার শাস্তি পেতেই হবে। এটাই আমি শিখেছি। তাই আমি আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে সর্বদা তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি।

আমি বললাম, এটা ঠিক নয়। আল্লাহকে নিম্নস্বরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে ডাকতে হয়। তিনি আপনার গর্দানের শিরার চাইতেও নিকটে রয়েছেন। তিনি আপনার সব কথা শুনছেন ও আপনাকে দেখছেন'। সে আমার কথা মেনে নিল।

অতঃপর বললাম, আপনার মিথ্যা কেইসটা কি? সে বলল, সেতো এক আজব ঘটনা! সন্ত্রাসীরা এক মোটরসাইকেল আরোহীকে হত্যা করে তার মোটরসাইকেলটি পুকুরে ফেলে দেয়। প্রায় তিন মাস পর এক কৃষক ঐ পুকুরে গোসল করা অবস্থায় সেটি পেয়ে আমার মোটরসাইকেল সারাইয়ের দোকানে মেরামত করার জন্য রেখে যায়। গোয়েন্দা বিভাগের তদন্তে সেটি ঐ নিহত ব্যক্তির বলে শনাক্ত হ'লে আমাকে এক নম্বর আসামী ধারণা করে পুলিশ মামলা দায়ের করে। আমি জানতে পেরে ঢাকায় পালিয়ে যাই এবং

একটি দোকানে কাজ নেই। প্রায় পাঁচ বছর পর খবরের কাগজে দেখলাম উক্ত কেইসে পলাতক আসামী আব্দুল মজীদকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেটা দেখে ঢাকাতেই জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নেই। সে মোতাবেক ওখানে বিয়ে করে অবস্থান করতে থাকি। এভাবে সাত বছর কেটে গেল। হঠাৎ সবার অজান্তে ছদ্মবেশে বাদ মাগরিব বাড়ীতে এসে ভোরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই, যাতে কেউ জানতে না পারে। কিন্তু ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন। রাতেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। এখন ফাঁসির সেলে।

আব্দুল মজীদ : স্যার আমাকে ইবাদতের নিয়ম-কানূন শেখাবেন কি? আমি তো সারা মাস রোযা রাখি। আর সারা রাত তাহাজ্জুদ পড়ি ও যিকর করি।

জবাবে আমি বললাম, না ভাই! আপনার ইবাদতের পদ্ধতি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হচ্ছে না। আল্লাহ কুরআনে সূরা মুযযাম্মিলে বলেন, হে চাদরাবৃত! তুমি রাত্রিতে দণ্ডায়মান হও কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধ্ব রাত্রি অথবা তার চেয়ে কিছু কম' *(মুযযাম্মিল ৭৯/১)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছওমে বেছাল (অর্থাৎ একটানা ছিয়াম পালন) করতে নিষেধ করেছেন।

আব্দুল মজীদ বলল, আপনি কি ঠিক বলছেন, জেলখানার মৌলভী ছাহেব তো আমাকে এই নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি ঠিক, না হুযূর ঠিক? আমার কাছে কুরআন শরীফ আছে। খুলে দেখি এই আয়াতগুলো সূরা মুযযাম্মিলে আছে কি-না। এরপর সে কুরআন মাজীদ খুলে সূরা মুযযাম্মিলের আয়াতগুলোর অনুবাদ দেখে আমার কথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করল। অতঃপর সে বলল, আমি সুবেদারের কাছে শুনলাম আপনাদের সাথে একজন বড় আলেম আছেন। তাঁর নাম ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। খুব আল্লাহভীরু মানুষ। তাঁকে নাকি বগুড়ার জনৈক ব্যক্তি খুব অত্যাচার করছে। তারই চক্রান্তে নানাবিধ মিথ্যা মামলায় নাকি উনি সহ আপনারা জেলখানায়। তার নাম-ঠিকানা বলুন। আমার উনিশটা হয়েছে, ওকে শেষ করে বিশ পূর্ণ করতে চাই'।

আমি বললাম, আপনি তো জেলখানায়? ওসব কাজ কিভাবে করবেন? সে বলল, স্যার চিন্তা করবেন না। আমার বহু কেরামতি আছে। আপনি নাম-ঠিকানা বলুন। কালকে দেখবেন খবরের কাগজে প্রকাশ হবে 'বগুড়ার ঐ

ব্যক্তিকে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে'। বলুন, তার নাম-ঠিকানা। ভয় করবেন না। আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কেউ জানবে না কিভাবে ঘটনা ঘটল।

আমি বললাম, থামুন! চিন্তা-ভাবনা করে পরে জানাব। পরে আমীরে জামা'আতের কাছে এসে এই কথা বললে উনি ধমক দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমরা দুনিয়াতে নিজ হাতে কারু বিচার তুলে নিতে চাই না। আমরা আল্লাহ্‌র উপরে বিচারের ভার অর্পণ করেছি। খবরদার! কখনও ঘুর্ণাক্ষরেও ঐ ধরনের চিন্তা মাথায় আনবে না'।

আমি আব্দুল মজীদের কাছে আমীরে জামা'আতের উক্ত জবাব শুনালে আব্দুল মজীদ চিৎকার করে বলে উঠল, উনি সত্যসত্যই আল্লাহ্‌র ওলী। যিনি হাতের কাছে প্রতিশোধের সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণ করলেন না। আল্লাহ তাঁকে মুক্তি দিবেন ও বিজয়ী করবেন *ইনশাআল্লাহ*। পরবর্তীতে সে ছহীহ-শুদ্ধভাবে ইবাদত শুরু করে। আমীরে জামা'আতের সুফারিশে পায়ের বেড়ীমুক্ত হয় এবং প্রতিদিন বিকালে ফাঁসির সেল থেকে আঙিনায় বের হবার সুযোগ পায়।

আযীযুল্লাহ্‌র পুত্র সন্তান লাভের খবর :

১০ই সেপ্টেম্বর'০৫ শনিবার আযীযুল্লাহ্‌র প্রথম সন্তান জন্মের খবর নিয়ে হাসতে হাসতে সুবেদার ছাহেব আসেন। দিনটি ছিল আমাদের জন্য খুবই আনন্দের। সবাই মিলে তার সন্তানের জন্য দো'আ করি। স্যার তার নাম রাখলেন 'ছালেহ' (সৎকর্মশীল)।

পরে একদিন আযীযুল্লাহ্‌র শ্যালক এসে জেল গেইটে দেখা করার জন্য স্লিপ পাঠালো। স্লিপ পেয়ে আযীযুল্লাহ খুব দ্রুত জেল গেইটে গিয়ে দেখা করল। অতঃপর হাতে মিষ্টির প্যাকেট ও কিছু ফল-মূল নিয়ে ফিরে এল। হাসতে হাসতে বলল, আজকে আমার এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ নাম স্বার্থক হ'ল। আপনারা আমার ছেলের জন্য দো'আ করুন। আমরা দো'আ করলাম এবং কিছুদিন পর আমি তাকে নীচের কবিতাটি উপহার দিলাম।-

হে ছালেহ! তোমাকে আহলান!
শান্তির জান্নাত ছেড়ে
মর্তের সংগ্রাম নীড়ে

তোমার আগমন
তোমাকে সাহলান।
বিশ্ব বিধাতার তুমি নে‘মত,
মোদের মমতায় তুমি আমানত,
এ যে মহান প্রভুর বিশেষ অবদান
তোমাকে আহলান, সাহলান।
প্রাচীরে ঘেরা মাযলূম মোরা
হাতে নেই কিছু দ্বীন ও দো‘আ ছাড়া
এ শুভ দিনে দো‘আ করি খুশী মনে,
তোমাকে যেন পাই মোরা পাঞ্জেরীসম
‘আহলেহাদীছ আন্দোলনে’ ॥

হামীদুল ইসলাম :

আব্দুল মজীদের সাথে নওগাঁ কারাগারে আরো একজন ফাঁসির আসামী ছিল; নাম হামীদুল ইসলাম। সে তার ৮/১০ বছর বয়সী সৎ ভাইকে হত্যার অপরাধে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত। হামীদুলের জ্ঞান-গরিমাও আব্দুল মজীদের মত। কারাগারে এসে কোন রকমে কুরআন মাজীদ পড়া শিখেছে। আব্দুল মজীদ এবং হামীদুলের ফাঁসির দণ্ড ছাড়াও মামলা ছিল। কোন ফাঁসির আসামীকে সাধারণত জেলা কারাগারে না রেখে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। যেহেতু তাদের আরো মামলা ছিল, সে কারণে তাদেরকে নওগাঁয় রাখা হয়েছিল। অনেকে আপন জনের সাথে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করার সুবিধার্থে জেলা কারাগারে থাকার কৌশল হিসাবে ইচ্ছা করেই নিজে থেকে কোন মামলা দিয়ে রাখে। হামীদুল ও আব্দুল মজীদ একই কক্ষে থাকে। একদিন তারা দু’জনে মারামারি করল। মজীদ ডাকাত হামীদুলের দাড়ি সব ছিঁড়ে ফেলল। পরে দু’জনেরই হাতে-পায়ে বেড়ী পরানো হ’ল।

জেএমবি আসামী :

জেএমবি কর্তৃক সারাদেশে একযোগে বোমা হামলায় নওগাঁ যেলাও বাদ পড়েনি। নওগাঁ শহরে আদালত পাড়া, মুক্তির মোড়, বাস স্ট্যান্ডসহ মোট ৫টি

পয়েন্টে সেদিন বোমা ফাটানো হয়। তবে সে হামলায় নওগাঁয় কেউ হতাহত হয়নি। উক্ত হামলার পর নওগাঁ যেলায় প্রথমে মাত্র একটি ছেলে ধরা পড়ে। ছেলেটির নাম আব্দুল কাইয়ূম। বয়স ২০-এর আশেপাশে। গায়ের রং ফর্সা, হালকা-পাতলা গড়ন। তেমন মেধাবী মনে হ'ল না। কিন্তু ইবাদত-বন্দেগীতে যথেষ্ট অগ্রগামী। আমাদের পাশের রুমে তাকে রাখা হয়। তার রুম সর্বদা তালা লাগানো থাকত। আমরা রুম থেকে বের হয়ে তার রুমের সামনে আসার সাথে সাথেই সুন্দর করে সালাম দেয়। মাঝে-মধ্যে তার সাথে আলোচনা করে জেএমবির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতাম। আমরা তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে বুঝাতাম যে, ইসলামে চরমপন্থার কোন স্থান নেই। মুহতারাম আমীরে জামা'আত যখন নওগাঁ কারাগারে আসতেন ও থাকতেন, তখন আব্দুল কাইয়ূমকে তিনি খুব সুন্দর করে এসব বিষয়ে বুঝাতেন। আব্দুল কাইয়ূম মুহতারাম আমীরে জামা'আতের কথা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতো। বিশেষ করে কুরআনের যে আয়াতগুলো তারা অপব্যাখ্যা করে থাকে, সেই আয়াতগুলো তাকে বেশী বেশী বুঝানোর চেষ্টা করতেন।

দু'তিন মাস পরের কথা। জানতে পারলাম, আমাদের পিছনের সেলে ৭/৮ জন নতুন আসামী এসেছে। তারা সবাই নাকি জেএমবির সদস্য। পরে জানা গেল তাদের সকলের যামিন হয়ে গেছে। কারণ তাদেরকে নিতান্তই সন্দেহের বশে ধরা হয়েছিল। এর কিছুদিন পর জেএমবি পরিচয়ে আবার কয়েকজন নতুন আসামী কারাগারে আসল। তারা নাকি নওগাঁর কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাঁশ বাগানে বসে হামলার পরিকল্পনা করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে গিয়ে তাদেরকে বিস্ফোরক দ্রব্যসহ গ্রেফতার করেছে। তারা সবাই হানাফী মাযহাবের অনুসারী, তবে শিক্ষিত। দু'একজন বাদে সকলেই ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষক। এক পর্যায়ে তাদেরকে আমাদের সেলের একটি কক্ষে রাখা হ'ল। ফলে তাদের সঙ্গে আমাদের সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ হ'ল। আব্দুল কাইয়ূমের মত তাদের কাছেও আমাদের দাওয়াতী কাজ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আলেম মানুষতো, এ কারণে তারা সহজে বুঝতে চাইতো না। এক পর্যায়ে তাদের নামে ৪/৫টি মামলা দেওয়া হয়। আমরা বের হওয়ার পরে জানতে পারি তাদের প্রত্যেকের কোন মামলায় ৩০ বছর, কোন মামলায়

১৪ বছর, কোন মামলায় ১০ বছর এমনি করে প্রত্যেকের ৮৫/৯০ বছর করে কারাদণ্ড হয়েছে।

এরপর জেএমবির আরেক সদস্য আসল। নাম হাফেয মিনহাজ। বাড়ি বগুড়া, বয়স ২০-এর কম। ছেলেটির পরিবারের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। নওগাঁয় একটি হাফেযী মাদ্রাসায় থাকতো। সে জেএমবির সক্রিয় সদস্য ছিল। কপাল দোষে ছেলেটি গ্রেফতার হয় ও সাজা ভোগ করে। মিনহাজ বলেছে, একদিন সে তার এক সাথী ভাইকে ফোন করে। সে তখন রাজশাহীতে র‍্যাবের হাতে বন্দী, সেটা মিনহাজ জানতো না। র‍্যাব তাকে বলে, তুমি যে আমাদের কাছে বন্দী আছো তা ওকে বলবে না। তুমি স্বাভাবিক কথা বলে কৌশলে ও এখন কোথায় আছে সেটা জেনে নাও। মোবাইলে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, মিনহাজ তুমি এখন কোথায়? সে বলে, আমি আমার মাদ্রাসায় আছি। তখন তাকে বলা হয়, তুমি থাকো আমি আসছি। র‍্যাব তখন রাজশাহী থেকে ঐ ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত নওগাঁয় এসে সেই মাদরাসা থেকে মিনহাজকে গ্রেফতার করে সরাসরি রাজশাহী নিয়ে চলে যায়। সেখানে তাকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্বীকারোক্তি আদায় করে নওগাঁর সদর থানায় হস্তান্তর করে। কিন্তু বাইরের যোগাযোগের কারণে হোক অথবা ভুল করে হোক নওগাঁ থানা মিনহাজের নামে কোন মামলা না দিয়ে ৫৪ ধারায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে প্রেরণ করে। কোন দিন তাকে কোর্টেও নেয় না, আবার তার যামিনও হয় না। এমনিভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। এমতাবস্থায় একদিন কারাগার পরিদর্শনে গেলেন নওগাঁর পুলিশ সুপার মহোদয়। কেউ কারাগার পরিদর্শনে গেলে সেদিন কারা অভ্যন্তরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ সর্বস্তরে অন্য রকম সাড়া পড়ে যায়। আর কে পরিদর্শনে আসছেন তাও আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এদিন মিনহাজ মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, আমার রুমের সামনে এসপি ছাহেব আসলে আমার বিষয়টা তাঁকে সরাসরি বলব। যথারীতি এসপি ছাহেব কারাগারে প্রবেশ করলেন, ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনে আমরা সেটা বুঝতে পারলাম। এক পর্যায়ে তিনি আমাদের সেলে ঢুকলেন। আমাদের সাথে বিশেষ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে অনেকক্ষণ খোশগল্পের মত আলাপ করলেন। এরপর মিনহাজের পালা।

এসপি ছাহেব যখন তার রুমের সামনে গেলেন, তখন সে তাঁকে সালাম দিয়ে বলল, স্যার আমি বিনা বিচারে এভাবে কতদিন থাকব? এসপি ছাহেব বললেন, কেন তোমার কি মামলা? সে বলল, আমার কোন মামলা নেই, ৫৪ ধারায় আটক দেখানো হয়েছে। এসপি ছাহেব বললেন, তোমার সমস্যা কি? মিনহাজ বলল, আমাকে জেএমবি সন্দেহে ধরা হয়েছে। তখন এসপি ছাহেব বললেন, আমার যেলায় কোন জেএমবি তো ৫৪ ধারায় থাকার কথা নয়। তখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বিষয়টির নোট নিতে বললেন।

এক অথবা দু'দিন পর মিনহাজের আদালতে ডাক পড়ল। যথারীতি তাকে পরপর দু'বারে সম্ভবত ৮ বা ১০ দিন পুলিশ রিম্যাণ্ডে নিল। রিম্যাণ্ড শেষে মিনহাজ ফিরে আসলে জানতে পারলাম, স্বীকারোক্তি তো আদায় করেছেই, সেই সাথে যথেষ্ট অত্যাচার করেছে। অবশেষে মিনহাজ আব্দুল কাইয়ূমের কেস পার্টনার হয়ে গেল। অর্থাৎ তাকে আব্দুল কাইয়ূমের মামলায় 'শোন এ্যারেষ্ট' আসামী করা হ'ল। উক্ত মামলায় উভয়কে নিম্ন আদালত ফাঁসির দণ্ড প্রদান করে। পরে উচ্চ আদালতে আপিল করলে তাদের সাজা কমিয়ে ১০ বছর কারাদণ্ড প্রদান করে।

নেশাখোর আসামী : একদিন এক আসামীকে হাতে-পায়ে বেড়ী ও দড়ি বেঁধে আমাদের সেলে আনা হ'ল। লোকটি যেমন স্বাস্থ্যবান, তেমনি শক্তিশালী। একতলা ভবনের প্রতিটি সেলে ৫টি করে রুম। আমরা এক প্রান্তের পাশাপাশি দু'টি রুমে আছি। ছেলেটিকে অপর প্রান্তের শেষ রুমে একা রাখা হ'ল। জানতে পারলাম, লোকটিকে গাজা বা হেরোইন খেতে বাধা দেওয়ার কারণে নিজের স্ত্রীকে দরজার হাক (যা দিয়ে দরজা আটকানো হয়) দিয়ে বাড়ি মেরে আহত করেছে। স্ত্রী চিৎকার করতে করতে বাথরুমে গিয়ে দরজা আটকে দিয়ে প্রাণে বেঁচে গেছে। বৌমার চিৎকার শুনে নেশাগ্রস্ত ছেলেকে বকাঝকা করতে করতে মা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকেন। ছেলে তখন নেশার ঘোরে হাতে থাকা সেই 'হাক' দিয়ে সজোরে মায়ের মাথায় বাড়ি মারে। এক বাড়িতে মাথা ফেটে মা ওখানেই মারা যান। মায়ের এই অবস্থা দেখে বাবা ছুটে আসেন, বাবাকেও অনুরূপ এক বাড়ি মারে। বাবাও ঐ জায়গায় শেষ। এরপর সে উন্মাদের মত বাড়ির ছাদের উপরে উঠে আবোল-তাবোল বকতে থাকে। এ

অবস্থা দেখে পাশের বাড়ির লোকজন পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে দেখে এই পরিস্থিতি। তখন পুলিশ ও প্রতিবেশীরা তাকে বাড়ির ছাদ থেকে জোর করে নামিয়ে এনে গ্রেফতার করে এবং তার আহত স্ত্রীকে বাথরুম থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

ঘটনা জানতে পেরে আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তখন মুহতারাম আমীরে জামা'আত আমাদেরকে বললেন, আল্লাহ কি জন্য নেশাকে হারাম করেছেন, তার বাস্তব প্রমাণ দেখে নাও। একথা বলে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে নেশার কুফলের উপর নাতিদীর্ঘ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য দিলেন।

এই ছেলেকে কারাগারে আনার পর থেকে সে অদ্ভূত অদ্ভূত সব আচরণ করে। কারাগারের ম্যাট-পাহারা সবাই তার কাছে যেতে ভয় পায়। তাকে খাবার দেওয়ার সময় খুব সতর্কভাবে দেয়। যাতে সে তাদের উপর আক্রমণ করতে না পারে। রাত গভীর হয়েছে, আমরা সবাই যে যার মত ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ দেখি প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে গোটা ভবন কাঁপছে। ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? কিন্তু না, পরক্ষণে বুঝতে পারলাম ঐ ছেলেটা তার সেলের লোহার দরজা ধরে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সজোরে ঝাঁকি দিচ্ছে। বাবু (কারারক্ষী) বলছে, স্যার, ও কোন কথাই শুনছে না। সকালে উঠে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বললেন, নূরুল ইসলাম! আমার তো সন্দেহ হচ্ছে। এই ছেলেকে এভাবে আমাদের সেলে রাখা কোন ষড়যন্ত্র নয়তো? ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, যুগে যুগে বহু মনীষীকে কারাগারে নানা কৌশলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। যাতে তারা আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হ'তে বাধ্য হয়। বাস্তবতা এই যে, ঐ ছেলেটা যতদিন আমাদের সেলে ছিল, তত দিন তার অত্যাচারে আমরা কেউই ঠিক মত ঘুমাতে পারিনি।

জানতে পারলাম, ছেলেটি তার ধনী বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। নওগাঁ শহরেই দোতলা বাড়ি। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ওর নিকটাত্মীয়রা ওকে মানসিক রোগী সাজিয়ে মামলা থেকে মুক্তির চেষ্টা করছে। সেই সূত্র ধরে তাকে নওগাঁ কারাগার থেকে চিকিৎসার অজুহাতে পাবনা মেন্টাল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ছেলেটি সেল থেকে বিদায় হওয়ায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

ফার্মাসিস্ট শাহজাহানের 'আহলেহাদীছ' আক্বীদা গ্রহণ :

কারা হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট শাহজাহান অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ও সদালাপী দ্বীনদার তরুণ ছিলেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন ইসলামী সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট থাকলেও আমীরে জামা'আতের সাথে 'ইক্বামতে দ্বীন' বিষয়ে আলোচনায় স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার পর 'আহলেহাদীছ' আক্বীদা গ্রহণ করেন। তিনি যতদিন নওগাঁতে ছিলেন, ততদিন আমাদের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেছেন। পরে তিনি অন্য কারাগারে ট্রান্সফার হয়ে যান।

সার্জন নূরুল ইসলামের 'আহলেহাদীছ' আক্বীদা গ্রহণ :

সিভিল সার্জন নূরুল ইসলাম নওগাঁ শহরের একজন সুপরিচিত ও বিজ্ঞ ডাক্তার। বয়স ৮১ বৎসর। জমি-জমার দখল নিয়ে প্রতিপক্ষের সাথে মারামারিতে তার জমির উপর এক চেয়ারম্যান নিহত হয়। উক্ত মামলায় তার ফাঁসির রায় হয়। আমরা বিকালে সেলের সিঁড়িতে বসে খবরের কাগজ পড়ছি। এমন সময় দেখি আমাদের সেলের পূর্ব পার্শ্বের রুমে ডাঃ নূরুল ইসলামকে নিয়ে হাযির। ডাক্তার ছাহেব কাঁদছেন আর আল্লাহকে ও জজ ছাহেবকে বেপরোয়াভাবে ফাহেশা কথায় গালি-গালাজ করছেন। তার কান্না দেখে আমরা তার কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি তো আমাদের দেখে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে আলেম-ওলামাকে গালি দেওয়া শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর শান্ত হ'লে আমরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে আসলাম। পরের দিন ভোরে লকাপ খুললে তার কাছে গেলাম। অতঃপর ছালাতের কথা বলতেই তিনি ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে ছালাতী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নানা রকম কুট মন্তব্য করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে 'আল্লাহ নেই' বলে যুক্তি দিতে থাকলেন। সেদিন আমরা তার কথার প্রতিবাদ না করে তাঁকে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়ে চলে আসলাম। পরের দিন ঠাণ্ডা মেযাজ দেখে তার কাছে গিয়ে 'দাদু' ডেকে গল্পের সূচনা করলাম। এক পর্যায়ে তার ফাঁসির রায়ের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বিস্তারিত ঘটনা বললেন।

যার সারসংক্ষেপ হ'ল, ২২ বিঘা জমি এক হিন্দু প্রথমে ডাক্তার ছাহেবের কাছে বিক্রি করে। তার তিন মাস পরে গ্রামের চেয়ারম্যানের কাছে ঐ জমি পুনরায় বিক্রি করে সে ভারতে পালিয়ে যায়। পরে জমির দখল নিয়ে মারামারি হয়। প্রতিপক্ষ তাকে হত্যা করার জন্য 'ফালা' উত্তোলন করতেই তিনি আত্মরক্ষার

জন্য তার লাইসেন্স করা বন্দুক দিয়ে গুলি করেন। গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে চেয়ারম্যানের বুকে লাগে এবং তিনি নিহত হন। এই সময় সমস্ত লোক পালিয়ে যায়। তখন আমার গায়ের কোট খুলে চেয়ারম্যানের গায়ে পরিয়ে দেওয়া হয়। যাতে ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রমাণ করা যায় যে, শরীরে গুলির আঘাত আছে। কিন্তু কোট ছিদ্র হয়নি। এটা কি করে হয়? সুতরাং বলা হবে যে, সে আত্মহত্যা করেছে অথবা তার নিজের লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেলে রেখে গেছে'। অতঃপর কেইস চলতে থাকে থানা, কোর্ট, সাক্ষী, উকিল, জজ সবার সঙ্গে কথা বলে সবকিছু ঠিকঠাক করা হয়। কিন্তু রায়ের দিন নতুন জজ এসে হঠাৎ ফাঁসির রায় দেন। একেই বলে তাকদীর। একেই বলে কপালের লিখন।

বললাম, আচ্ছা ডাক্তার ছাহেব! আপনিই বললেন যে 'আল্লাহ' বলে কিছু নেই। আবার আপনিই বলছেন তাকদীর? বললেন, শুনুন! আমি তো হুযূরদের উপর রাগ করে বলেছি। আচ্ছা বলুন তো যে মারা যায়, তার রূহ আবার কিভাবে মীলাদের মাহফিলে হাযির হয়? আর তার সম্মানে আমাদের দাঁড়াতে হবে? আচ্ছা মীলাদে যদি এত বরকত হয়, তাহ'লে হুযূরের বাড়ীতে মীলাদ হয় না কেন? হুযূর বলেন, ছালাত মানুষকে খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখে। তাহ'লে যে হুযূর ২২ বছর ধরে আমার মসজিদে ইমামতি করল, সে আবার কি করে ক্যাশ বাক্স ভেঙ্গে টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল? সেদিন খেদু তার বউয়ের উপর রাগ করে বউকে তিন তালাক দিল। আর হুযূর তাকে হিল্লা করার জন্য তাকে বিয়ে করে বউটা নিয়ে পালালো। এইগুলি যদি ইসলাম হয়, তো সে ইসলাম আমি মানি না।

তিনি বললেন, হুযূরদের আল্লাহ ধরতে পারে না, শুধু আমাকে দেখতে পায়? আমি বললাম, দাদু আল্লাহ্র শানে এসব কথা বলতে হয় না। আমাদের দেশে ইসলাম দুই প্রকার। এক- পপুলার ইসলাম। দুই- পিওর ইসলাম। পিওর ইসলামে মীলাদ নেই, হিল্লা নেই। আমরা সেই ইসলামে বিশ্বাসী। বললেন, আচ্ছা! পিওর ইসলাম কেমন? বললাম, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যা আছে, সেটাই পিওর ইসলাম। আর আমরা সেটাই মেনে চলি। আমরা মনে করি আল্লাহ সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তিনি আপনাকে ফাঁসিও দিতে পারেন, বাঁচাতেও পারেন। অতীতে এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে। এমনকি ফাঁসির দড়ি

পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে। আমীরে জামা'আতের থিসিসের মধ্যে পড়েছি 'সাতক্ষীরার মর্জুম হোসেনের ফাঁসির দড়ি তিনবার ছিঁড়ে গেলে ইংরেজ বিচারক ফাঁসির রায় বদলিয়ে তাকে মুক্তি দেয় *(থিসিস পৃঃ ৪২১)*।

তখন উনি বললেন, আপনি আমাকে ছহীহ-শুদ্ধভাবে নামায শিখিয়ে দিন। বললাম, আমরা নামায বলি না, ছালাত বলি। 'নামায' অর্থ কুর্ণিশ করা। আর 'ছালাত' অর্থ আল্লাহ্র শিখানো পদ্ধতিতে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করা। মৌলভীদের কাছে আগে যা শিখেছি সবই ভুল। অতঃপর আমরা ডাক্তার ছাহেবকে ছালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিলাম। তিনি ছালাত সহ বিভিন্ন বিষয় মাঝে-মধ্যে জিজ্ঞেস করে শুদ্ধ করে নিতেন। তিনি রাজনীতির বিষয়টি নিয়ে সালাফী ছাহেব ও আযীযুল্লাহ্র সাথে তর্ক করতেন। সবশেষে তিনি প্রচলিত রাজনীতিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি বলতেন, 'আল্লাহ্র রহমতে আপনাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। নইলে আমি নাস্তিক হয়েই মারা যেতাম'। পরে তাকে জেলখানায় রেখেই আমাদের বিদায় নিতে হ'ল। বিদায় ক্ষণে তিনি অঝোর নয়নে কেঁদে কেঁদে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জন্য ও আমাদের জন্য দো'আ করলেন এবং তাঁর মুক্তির জন্য দো'আ চাইলেন। বর্তমানে আপিলের মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে তিনি ছহীহ আক্বীদার উপরে টিকে আছেন।

বাচ্চু ম্যাট :

একদিন রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে একজন পুরাতন কয়েদী বদলী হয়ে নওগাঁ কারাগারে এল। তার নাম রেযাউল করীম বাচ্চু। বাড়ী ময়মনসিংহ যেলায়। তাকে প্রথমে আমাদের সেলের একটি রুমে রাখা হয়। বদলী হয়ে আসা কোন আসামীকে আসার পরপরই কোন কাজ দেওয়া হয় না। প্রথমে তাকে কিছুদিন পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। বাচ্চুর ক্ষেত্রেও তাই হ'ল।

সে একটি হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী। ঘটনার সময় বাচ্চুর বয়স ১৪ বছরের কম হওয়ায় কিশোর আইনে তাকে ফাঁসি না দিয়ে যাবজ্জীবন অর্থাৎ ৩০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এখন সে পূর্ণ যুবক। বাচ্চু ধবধবে ফর্সা, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চতুর এবং অভিজ্ঞ ম্যাট। অনেক ক্ষেত্রে কারা কর্মকর্তারাও তার বুদ্ধির কাছে হার মানতো। সে দীর্ঘ দিন রাজশাহী কেন্দ্রীয়

কারাগারে প্রধান ম্যাটের দায়িত্ব পালনসহ সিআইডি হিসাবেও কাজ করে। কারা অভ্যন্তরে কারারক্ষী, জামাদার, সুবেদার প্রভৃতি নিম্ন ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মচারী-কর্মকর্তারা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করছে কি-না, এ বিষয়ে বাচ্চু সিআইডি হিসাবে জেলার বা সুপার ছাহেবকে রিপোর্ট করত। তার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে নাকি অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর কমবেশী বিভাগীয় শাস্তিও হয়েছে। কারাগারের পুরাতন কয়েদীর প্রায় সকলেই এক নামে বাচ্চুকে চেনে। কারণ সে দীর্ঘ কারা জীবনে বিভিন্ন মেয়াদে ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের বড় বড় দশটি কারাগারে বদলি হয়েছে। নিজের দীর্ঘ কারাজীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে একদিন বাচ্চু বলে, স্যার! একবার রাজনৈতিক কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০/৬০ জন শিবিরের ছাত্রকে ধরে কারাগারে পাঠাল। কারাগারে তাদেরকে এক সাথে রাখা যাবে না। আবার শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল তাদেরকেও এক ওয়ার্ডে রাখা ঠিক হবে না। কিন্তু এতগুলো ছেলের মধ্যে কিভাবে সেটা বাছাই করা যাবে, এ নিয়ে কারা প্রশাসন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। বাচ্চু বলল, স্যার, চিন্তা করবেন না, ও দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন। আমি তখন তাদের কাছে গিয়ে বললাম, দেখেন আপনাদের সকলকে আমরা এক ওয়ার্ডে জায়গা দিতে পারবো না। ৫টি ওয়ার্ডে ভাগ করে রাখব। এখন আপনাদের যার যার সাথে ভাল বন্ধুত্ব আছে, তারা তারা মিলে নিজেরা ৫ ভাগে ভাগ হন। তখন সবাই খুশী মনে যার যার বন্ধুর সাথে মিলে ৫ ভাগে ভাগ হয়ে গেল। আমি তখন তাদের প্রত্যেক দল থেকে একজন একজন করে নতুন দল করে আমাদের মত করে সাজিয়ে নিলাম। আমার বাছাই কৌশল দেখে কর্তৃপক্ষ খুবই খুশী হ'ল।

এক পর্যায়ে বাচ্চুকে আমাদের সেলেই কাজ দেওয়া হ'ল। বাচ্চুর বিবরণ মতে তার পিতার বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় হয়। তখন সে পিতাকে বাঁচানোর জন্য নিজেই দোষ স্বীকার করে। তখন পিতা মুক্তি পায়। কিন্তু বয়সে কিশোর বিবেচনা করে তাকে ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এরশাদের আমলে যাবজ্জীবনের মেয়াদ ২০ বছরের স্থলে ৩০ বছর হওয়ায় সে এখনো জেল খাটছে। উল্লেখ্য যে, কারাগারে ৯ মাসে বছর হয়। সে হিসাবে ২০ বছর ১৪ বছরে শেষ হয়। সে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এরশাদ

ছাহেবের ম্যাট ছিল। 'দেখা' এলে তিনি কিভাবে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেন, গোপনে অন্যান্য কি কি কাজ করতেন, এসব অনেক কিছু খবর সে শুনাতো। সে প্রায়ই বলত, 'প্রেসিডেন্ট হয়েও এরশাদ ছাহেব কারাগারে যে সম্মান পাননি, আপনারা তার চাইতে অনেক বেশী সম্মানের সাথে আছেন'।

আমীরে জামা'আত আখেরাতের পথ প্রদর্শক :

কালের আবর্তে দিন গুনতে গুনতে ইতিমধ্যেই কারাজীবনের মেয়াদ ৭/৮ মাস হয়ে গেল। বহু আসামীর যামিন হচ্ছে দেখে আমাদের মনেও যামিনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হ'ল। ইতিমধ্যে হাইকোর্ট পর্যন্ত যামিন নামঞ্জুর করেছে। ফলে কারাজীবন দীর্ঘায়িত হচ্ছে ভেবে আমরা মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। হঠাৎ একদিন সালাফী ছাহেবের বড় ছেলে আব্দুল আহাদ দেখা করতে আসল। তার সাথে দেখা করে এসে সালাফী ছাহেব চিৎকার করে বলতে লাগলেন, আমাদের আর যামিন হবে না। অন্যান্য সংগঠন তাদের নেতা-কর্মীদের জন্য যেভাবে চেষ্টা-তদবীর করে, টাকা খরচ করে, আমাদের জন্য তা করা হচ্ছে না। বরং শুনতে পেলাম আমীরে জামা'আতকে আগে বের করবে, তারপর আমাদের জন্য চেষ্টা করবে। আব্দুল লতীফ বলেছে, এ ব্যাপারে আমাদের রেজুলেশন হয়েছে। আমি আমার ছেলেকে বললাম, 'কারুর ভরসা কর না। আমার শহরের বাড়ী বিক্রি করে হ'লেও আমাকে বের কর। আমি বেরিয়ে গিয়ে আমার ভাতীজা মুজীবুর রহমানকে বলে অন্যদের মুক্ত করব। আব্দুল লতীফকে দেখে নেব' ইত্যাদি আবোল-তাবোল বকতে লাগলেন। অধ্যাপক মুজীবুর রহমান (গোদাগাড়ী, রাজশাহী) তখন 'জামায়াতে ইসলামী'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

আমীরে জামা'আত বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে শুনে ধীর কদমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন এবং বললেন, আপনারা কি আল্লাহকে ভুলে গেছেন? তাকদীরকে অস্বীকার করছেন? জেলখানার একটি দানা বাকী থাকতেও আপনারা বের হ'তে পারবেন না। আপনারা ইবাদত-বন্দেগী বাদ দিয়ে গীবত-তোহমতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) জেলখানাতে কাগজ-কলম থেকে বঞ্চিত হয়ে অবশেষে মুখস্থ কুরআন ২৭ পারা পর্যন্ত পাঠ করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পূর্বের আলেমদের উপর যেসব

নির্যাতন এসেছিল সেগুলি স্মরণ করুন! আপনারা সুন্দর পরিবেশ পেয়েছেন। উত্তম খাবার পাচ্ছেন। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করুন। ইবাদতে মন দিন। কুরআন-হাদীছ মুখস্থ করতে শুরু করুন। আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করুন। তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট' (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ) নূরুল ইসলাম! কুরআন মাজীদ নিয়ে আসো, আযীযুল্লাহ যাও, কুরআন নিয়ে ছহীহ-শুদ্ধভাবে ক্বিরাআত শিখ ও মুখস্থ কর। তোমাদের কি শুক্রবারের ফজরের ছালাতের সুন্নাতী ক্বিরাআত মুখস্থ আছে? উত্তর আসলো, না। দুই দিনের মধ্যে সূরা সাজদাহ ও দাহ্‌র মুখস্থ করে আমাকে শুনাও।

আমীরে জামা'আতের ধমক খেয়ে আর হুকুম পেয়ে আরম্ভ হ'ল কুরআন মুখস্থের পালা। জেলখানা যেন হেফযখানায় পরিণত হ'ল। সকাল-বিকাল ব্যায়াম করা আর কুরআন পড়া আমাদের দৈনন্দিন রুটিন হয়ে গেল। আযীযুল্লাহ কুরআন মাজীদ পাঠের ফাঁকে ফাঁকে তার পি.এইচ.ডির কাজ এগিয়ে নিতে আমীরে জামা'আতের সহযোগিতা পেল। ফলে আমাদের জন্য কারাগার হ'ল শিক্ষাগার।

আমীরে জামা'আতের কুরআন হেফয :

আমীরে জামা'আত নওগাঁ জেলে আসার পর থেকে কারা লাইব্রেরীর বই ও বাসা থেকে আনানো কিতাব-পত্র নিয়ে সর্বদা লেখা-পড়ায় ব্যস্ত থাকতেন। রাত্রিতে খাওয়ার পর অভ্যাস অনুযায়ী তালাবদ্ধ কক্ষের মধ্যে পায়চারি করতেন ও সরবে মুখস্ত কুরআন তেলাওয়াত করতেন। একদিন আমাকে ডেকে বাউণ্ড বুক খাতা দেখিয়ে বললেন, দেখ নূরুল ইসলাম! জেলখানায় এসে আমার কতটা লাভ হয়েছে। এবার তিনি লিখিত তালিকা দেখিয়ে বললেন, গতকাল পর্যন্ত আমার মুখস্ত আয়াত সংখ্যা হ'ল ১৩৮৬। ঐদিন ছিল ১৮.০৮.২০০৫ইং বৃহস্পতিবার। যার মধ্যে ১ম পারা, ২৯ ও ৩০ পারা এবং সূরা লোক্বমান, সাজদাহ, ইয়াসীন, হুজুরাত, ক্বাফ, রহমান, ওয়াক্বে'আহ, ছফ, জুম'আহ, মুনাফিকূন, মুল্‌ক, নূহ, মুদ্দাছছির ও দাহ্‌র সহ ১৪টি সূরা পুরোপুরি মুখস্ত। এছাড়া অধিকাংশ বড় বড় সূরার মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্ত করেছেন। খাতায় যে সবের তালিকা আছে। এরপর নওগাঁ ছাড়ার আগ পর্যন্ত তিনি সূরা মা'আরেজ, মুয্‌যাম্মিল ও অন্যান্য সূরা সমূহ মুখস্ত করেন। পরে

শুনেছি বগুড়া কারাগারে গিয়ে তিনি সর্বমোট ৩৮ বার কুরআন খতম করেন। যাতে ৩ হাযারের ঊর্ধ্বে আয়াত সমূহ তাঁর মুখস্ত হয়ে যায়। যা অর্ধেক কুরআনের সমান। এছাড়া দৈনিক বারবার পাঠ করার কারণে কুরআনের এমন কোন স্থান নেই, যেখানে কেউ ভুল করলে তিনি ধরতে পারেন না। অধিকাংশ সূরায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে একই নবীর ঘটনা বিভিন্নভাবে আসায় তাঁর মনের মধ্যে 'নবীদের কাহিনী' লেখার চিন্তা আসে। ফলে আমরা তাঁর হাত দিয়ে পরবর্তীতে পেয়েছি নবীদের কাহিনী-১, ২ ও ৩-এর মত মূল্যবান তিনটি গ্রন্থ। যার অধিকাংশ কুরআনের আয়াত সমূহের উপর ভিত্তিশীল।

নওগাঁ থেকে আমীরে জামা'আতের বিদায় :

৩.১০.২০০৫ইং বুধবার সকালে কুরআন তেলাওয়াতের পর নাশতা করছি। এমন সময় খবর এল যে, আমীরে জামা'আত বগুড়া যাচ্ছেন। সেখানে কাল হাযিরা দিয়ে পরদিন ফিরে আসবেন। কেননা নওগাঁতে পরবর্তী রবিবার মামলার তারিখ আছে। কিন্তু ঐ সময় প্রচণ্ড বন্যা হওয়ায় তারিখের দিন স্যারকে আনা হলো না। পরে স্যারের কাপড়-চোপড় ও বই-পত্র এখান থেকে বগুড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আর কোনদিন স্যার নওগাঁয় ফিরে আসেননি। কিন্তু তখন কে জানতো যে এটাই তাঁর শেষ যাওয়া! যাইহোক কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। যাওয়ার সময় আমি স্যারের হাতে ২০ টাকার একটা নোট গুঁজে দিলাম। স্যার ওটা ফেরৎ দিয়ে বললেন, নূরুল ইসলাম 'টাকা নয় আল্লাহ আমাদের সাথী'। আমরা অশ্রুসজল নেত্রে স্যারকে বিদায় দিলাম।

আমীরে জামা'আতের বিদায়ে আব্দুল জাব্বার ম্যাট :

আমীরে জামা'আতের বিদায়ের সময় আব্দুল জাব্বার বিহারী চৌকায় কাজ করত। পরে জানতে পেরে একদিন সাক্ষাতে সে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। সে বলল, হায়! আজ থেকে তা হারিয়ে ফেললাম। তাঁর সাথে বসে মনের কথাগুলি বলার সময়ও হ'ল না। যাওয়ার সময় দো'আ চাইব, কিন্তু মনের ব্যথায় মুখে কথা বের হচ্ছিল না। এই বলে আকাশের দিকে দুই হাত তুলে কাঁদতে কাঁদতে বলল, হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে মুক্তি দাও! তাঁর মান-সম্মান বৃদ্ধি কর, তাঁকে হেফাযত কর'।

আমীরে জামা'আতের অবর্তমানে আমরা :

সালাফী ছাহেবের সাথে আযীযুল্লাহ্র ঝগড়া লেগেই থাকত। আমি মাঝে থেকে উভয়কে থামাতাম। কিন্তু তাতেও পারা যাচ্ছিল না। অবশেষে আমীরে জামা'আত আমাদেরকে সর্বদা কুরআন পাঠ ও কিছু অংশ মুখস্ত করে তাঁকে দৈনিক শুনানো বাধ্যতামূলক করে দিলেন। তাতে ঝগড়া থামল। আমীরে জামা'আত চলে যাওয়ার সময় আমাদেরকে কঠোরভাবে এ নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। ফলে আমরা তা আমল করতে থাকলাম। ঝগড়ার সুযোগই হতো না। ফলে একদিন সুবেদার ছাহেব এসে মুচকি হেসে বললেন, 'আমীরে জামা'আত বাইরেও ছিলেন শিক্ষক, কারাগারেও তেমনি শিক্ষক'।

সরকার মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে বগুড়ায় পৃথকভাবে আরও তিনটা মামলা ছিল। ঐ মামলায় হাযিরা দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র তাঁকে মাঝে-মধ্যে বগুড়ায় নিয়ে যাওয়া হ'ত। তাছাড়া গাইবান্ধার দু'টি মামলায় আমরাও আসামী ছিলাম। কিন্তু আমাদের তিনজনকে সেখানে কোনদিন নিয়ে যাওয়া হয়নি। এ কারণে মাঝে মাঝে আমরা নওগাঁতে আমীরে জামা'আত ছাড়াই থাকতাম। আবার তাওহীদ ট্রাস্টের অর্থ তছরুপের অভিযোগে সালাফী ছাহেবের নামে আগে থেকেই ঢাকায় মামলা ছিল। সেই মামলায় হাযিরা দিতে সালাফী ছাহেবও দু'বার নওগাঁ থেকে ঢাকায় গিয়েছিলেন। আরেকবার সালাফী ছাহেবকে চিকিৎসার জন্য রাজশাহীতে পাঠানো হয়। এ সময় আমি আর আযীযুল্লাহ নওগাঁয় থাকতাম। আমাদের দীর্ঘ কারাজীবনে আমরা দু'জন কোনদিন পৃথক হইনি। সর্বদা এক সঙ্গেই থেকেছি।

আমীরে জামা'আতের অবর্তমানে আমরা অত্যন্ত অসহায় বোধ করতাম। তাঁকে নিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। আমরা তো তিনজন একত্রে এক রকম আছি। কিন্তু তিনি একা একা কোথায় আছেন, কিভাবে থাকছেন, কিভাবে সময় অতিবাহিত করছেন ইত্যাদি নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করতাম। কিন্তু যখন তিনি ফিরে আসতেন, তখন তাঁর জীবনযাপনের বিবরণ শুনে খুশীতে মন ভরে উঠতো। কারণ তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই পুলিশ, কারারক্ষী, কয়েদী, কারাকর্তৃপক্ষ সকলেই তাঁকে অত্যন্ত সম্মান, শ্রদ্ধা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করত। মাঝে মাঝে ভাবতাম, তিনি আমাদের মাঝে থাকলে

হয়তো আমরাও তাঁকে তাদের মত করে সেবা-যত্ন করতে পারতাম না। সবই আল্লাহ্‌র মেহেরবানী। স্যারের অবর্তমানে কোন কর্তাব্যক্তি কারা পরিদর্শনে আমাদের সেলে এলে আগে স্যারের খোঁজ-খবর নিতেন। তাঁর শরীর কেমন আছে, তিনি এখন কোথায় আছেন, মামলার অবস্থা কি ইত্যাদি। তারপর আমাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন।

প্রথম দিকে স্যার মামলার হাযিরার জন্য গাইবান্ধা বা বগুড়ায় যেতেন, আবার ফিরে আসতেন। এভাবে কয়েকবার আসা-যাওয়া করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁকে আর আনা হ'ল না। আমরা তিনজন নওগাঁয় থেকে গেলাম, আর স্যারকে বগুড়া কারাগারে রাখা হ'ল। কারাগারে আমাদের আর মিলিত হওয়ার সুযোগ আসলো না। যখন জানতে পারলাম, স্যারকে আর নওগাঁয় আনা হবে না, তখন আমাদের এত খারাপ লেগেছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। স্যারকে নিয়ে নানা রকম দুশ্চিন্তা সারাক্ষণ আমাদের মাথায় এসে ভিড় করত।

আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ :

দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে কারাগারের একটা সাধারণ নিয়ম আছে। যেমন কোন বন্দীর সাথে কেউ একবার দেখা করলে ১৫ দিনের মধ্যে তার সাথে আর কেউ দেখা করতে পারবে না। বন্দীকে বাইরের রান্না করা খাবার দেওয়া যাবে না ইত্যাদি। প্রথম দিকে এটা আমাদের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে প্রযোজ্য ছিল। পরে শিথিল হয়। এমনও হয়েছে যে, সপ্তাহে আমাদের ৩/৪ দিন 'দেখা' এসেছে। নেতা-কর্মীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এক নযর আমাদেরকে দেখা এবং সাধ্যমত খাদ্য-পানীয় দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করা। আগেই বলেছি নওগাঁ কারাগারের পানিতে প্রচণ্ড আয়রন ছিল। সেকারণ আমাদের জন্য বাইরে থেকে বোতলজাত পানি আনার অনুমতি দেওয়া হয়। তখন কর্মীরা আমাদের জন্য পানির বোতল সরবরাহ করতে থাকেন। পরবর্তীতে আযীযুল্লাহ্‌র উদ্ভাবিত কৌশলে পানি সমস্যার একটা সমাধান হয়। তবে তা ছিল অপর্যাপ্ত।

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা অত্যন্ত খুশী এবং কৃতজ্ঞ ছিলাম এই ভেবে যে, আমাদের কর্মীরা আমাদেরকে এত বেশি ভালবাসে, যা বলে শেষ করা যাবে না। বিভিন্ন যেলা থেকে কর্মী ও দায়িত্বশীলরা যখন আমাদের সঙ্গে দেখা

করতে আসতেন, তখন তারা আপেল, কমলা, আঙ্গুর, কলা, বিস্কুটসহ নানা রকম খাদ্য-সামগ্রী এত বেশী পরিমাণ দিতেন যে, আমরা তা খেয়ে শেষ করতে না পেরে অন্যদের মাঝেও বিতরণ করতাম। আমের মৌসুমে আম তো ছিলই। আমার মনে হয় ঐ বছর কারাগারে বসে আমরা যে পরিমাণ আম খেয়েছি, ঐ পরিমাণ আম আমরা বাইরে থেকে কোন মৌসুমেই খাইনি। বিশেষ করে আমি ও আযীযুল্লাহ। এই অবস্থা দেখে আমীরে জামা'আত আমাদের বলতেন, দেখ আমাদের কর্মীরা যে আমাদেরকে এত ভালবাসে, তা এখানে না আসলে বুঝতেই পারতাম না। আজকের এই সুযোগে সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপাশি মহান আল্লাহ্‌র নিকটে এসো আমরা প্রার্থনা করি, যেন তিনি আখেরাতে কর্মীদের এই আন্তরিক মহব্বতের উপযুক্ত পুরস্কার দান করেন।

খাদ্যের ব্যাপারে আরেকটি কথা না বললে চরম অকৃতজ্ঞতা হয়ে যাবে। আগেই বলেছি, গ্রেফতারের প্রায় দেড় মাস পর প্রথম বাসার রান্না করা খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য হয় আমাদের নওগাঁ থানায় রিম্যাণ্ডে থাকা অবস্থায়। সেদিন আমীরে জামা'আতের বাসা থেকে রান্না খাবার আসে। এরপর যতদিন চারজন নওগাঁ কারাগারে একত্রে ছিলাম, ততদিন কোন দিন আমীরে জামা'আতের বাসা থেকে, কোন দিন সালাফী ছাহেবের বাসা থেকে মাঝে-মধ্যে রান্না করা খাবার আমাদের জন্য পাঠানো হ'ত। আমরা পরম তৃপ্তি সহকারে তা খেতাম। যখন আমীরে জামা'আত বগুড়ায় স্থায়ী হ'লেন, তখনও বাইরের খাদ্য আসা বন্ধ বা কমতি হয়নি। কোন দিন সালাফী ছাহেবের নিজের বাড়ি থেকে; কোন দিন বগুড়ায় তাঁর বড় মেয়ের বাড়ি থেকে; আবার কোন দিন রাজশাহীতে তাঁর মেঝ মেয়ের বাড়ি থেকে কখনো অন্য কর্মীদের বাড়ী থেকে রান্না খাবার আসত। এক্ষেত্রে আমি ও আযীযুল্লাহ পিছিয়ে ছিলাম। কারণ আমাদের দু'জনেরই বাড়ী ছিল অনেক দূরে। আমাদের প্রতি কর্মীদের এ ভালবাসা অব্যাহত ছিল। এজন্য আমরা সকলের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

মামলা থেকে একের পর এক অব্যাহতি :

আগেই বলেছি গ্রেফতারের পর আমাদের তিন জনের নামে মোট ৭টি এবং আমীরে জামা'আতের নামে অতিরিক্ত ৩টিসহ মোট ১০টি মামলা দায়ের করা

হয়। প্রথমে সকল মামলায় বিভিন্নভাবে আমাদেরকে জেআইসিতে ১০দিন সহ মোট ২০দিন এবং স্যারকে জেআইসিতে ২০দিন সহ মোট ৩০দিন রিম্যাণ্ডে নেওয়া হয়। তাতে প্রায় চারমাস অতিবাহিত হয়ে যায়। আমাদের নামে অন্যান্য যেলায় নির্দিষ্ট মামলা দেওয়ার কারণে রাজশাহীর ৫৪ ধারার মামলা থেকে আমরা প্রথমে অব্যাহতি পাই। অতঃপর সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার ব্যাংক ডাকাতি মামলা থেকে আমাদের সকলকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। এরপর জানতে পারলাম গাইবান্ধা যেলার গোবিন্দগঞ্জ ও পলাশবাড়ি থানার দু'টি মামলা থেকে আমাদের তিনজনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমীরে জামা'আতকে গোবিন্দগঞ্জ থানার মহিমাগঞ্জ ব্র্যাক অফিসে ডাকাতির মামলায় অব্যাহতি দেওয়া হ'লেও পলাশবাড়ী থানার তোকিয়ার বাজার গানের প্যাণ্ডেলে বোমা হামলা মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। খবরটি শুনে আনন্দের চেয়ে দুঃখই বেশি পেলাম। কিন্তু কিছুই করার নেই। পরে শুনেছি চার্জ গঠনকারী পুলিশ কর্মকর্তা ঐদিন হোণ্ডা এক্সিডেন্ট করে হাসপাতালে শুয়ে তার এই অন্যায়ের কথা সাথীদের কাছে বলে অনুতাপ প্রকাশ করেছেন।

পরবর্তী তারিখে আমরা চারজন নওগাঁ কোর্টে পোরশা থানায় ব্রাক অফিসে ডাকাতি মামলায় হাযিরা দিলাম। ঐ তারিখে উক্ত মামলা থেকে আমাদের চারজনকেই অব্যাহতি প্রদান করা হয়। এর মধ্যে জানতে পারলাম, গাইবান্ধা পলাশবাড়ীর পাশাপাশি বগুড়ার গাবতলী ও শাহজাহানপুর থানার তিনটি মামলাতেও আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। তখন অনেকে বলেছেন, সরকারের পরিকল্পনা হ'ল আপনাদের তিনজনকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া এবং আমীরে জামা'আতকে আটকে রাখা।

অবস্থাদৃষ্টে আমাদেরও তাই মনে হয়েছিল। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে আমাদেরকে চারটি মামলা থেকে এক প্রকার বিনা তদবীরে অব্যাহতি দেওয়া হ'ল। ধারণা করছিলাম, অন্য দু'টি মামলা থেকেও আমরা দ্রুত অব্যাহতি পাব। একদিন সকালে বিবিসির সংবাদে শুনলাম, 'আগামী ধার্য তারিখে নওগাঁর রাণীনগর থানার খেজুর আলী হত্যা মামলা থেকে ড. গালিব ও তাঁর সহযোগীরা অব্যাহতি পেতে যাচ্ছেন'। কিন্তু না, সেই অব্যাহতি পেতে আরো

এক বছর পার হয়ে গেল। অবস্থা ভাল নয় দেখে আমাদের নেতৃবৃন্দ আমীরে জামা'আতের মামলাসহ আমাদেরকে যামিন করানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে হাইকোর্টে বার বার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা আমাদের তিনজনের কোর্টে ডাক পড়ল। আব্দুল জাব্বার বিহারী একটা স্লিপ এনে আমাদের বলল, স্যার তৈরী হন! এখুনি আপনাদের কোর্টে যেতে হবে। আমরা বললাম, আজ এইচ.এস.সি বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা, কোর্ট তো হবে না। তাছাড়া এই দুপুর বেলা কেন? বিহারী বলল, আমি তো আদার ব্যাপারী, জাহাযের খবর কি করে রাখব স্যার? অতঃপর জামা-কাপড় পরে গেইটে গিয়ে দেখি আমাদের নেওয়ার জন্য কারা ফটকে বড় একটা প্রিজন ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। ঐ গাড়িতে সেদিন অন্য মামলার আরেক জনকে নিল। এই চারজনকে নিয়ে প্রিজন ভ্যানটি আদালতে পৌঁছল। আদালত চত্বর একেবারে জনশূন্য বললেও ভুল হবে না। আড়াইটার দিকে আমাদেরকে কাঠগড়ায় তোলা হ'ল। সেদিন আদালত কক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট ও আমরাসহ সর্বসাকুল্যে ১০ জনের মত লোক হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারে বসে কাগজ-কলম হাতে নিয়ে আমাদের উকিল আবু বেলাল জুয়েলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনার আসামীদের যামিনের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করুন। অন্যান্য দিন যে লোক উকিলের কথা শোনা তো দূরের কথা তার দিকে তাকায়ও না, সেই লোক আজ উপযাচক হয়ে উকিলকে বলছেন, যামিনের স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করার জন্য। তখন আমাদের উকিল কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করলেন। যেমন- (১) এই মামলার এজাহারে আমার কোন আসামীর নাম নেই। (২) তাঁরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক এবং একজন মাদ্রাসার বর্ষীয়ান প্রিন্সিপ্যাল, অর্থাৎ সকলেই সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁদের দ্বারা এরূপ জঘন্য কাজ হ'তে পারে না। (৩) ঘটনার স্থান নওগাঁর রাণীনগর। আর আমার আসামীদের কারো বাড়ি সাতক্ষীরায়, কারো বাড়ি মেহেরপুর, কারো বাড়ি রাজশাহীতে। এই পয়েন্টে এসে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আযীযুল্লাহ একটু সংশোধন করে দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাই লিখলেন। আযীযুল্লাহ বলল, এক কথায় আসামীদের কারো বাড়ি নওগাঁ যেলায় নয়। (৪) পুলিশ প্রতিবেদনে আমার চার আসামীর নামে অত্র মামলায় ফাইনাল রিপোর্ট (FRT) দেওয়া হয়েছে। তাই আমার আরয, আমার চারজন আসামীকে যেকোন শর্তে যামিন মনযূর করা হোক।

উল্লেখ্য যে, এদিন নির্ধারিত তারিখ ছিল না। পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে মনে করেছিলাম যে, এইচ.এস.সি পরীক্ষার কারণে আজ কোর্ট বসবে না। আমাদের উকিলকে তদন্তকারী কর্মকর্তা (আইও) বলেছেন, আমাকে উপর থেকে অর্ডার দিয়েছে আজই ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। ফলে দ্রুত আসতে গিয়ে হোণ্ডা এক্সিডেন্ট করে হাত ভেঙ্গেছি। ব্যান্ডেজ করা হাত নিয়ে তিনি কোর্ট লকাপে এসে আমাদের কাছে ক্ষমা চান।

এরপর ম্যাজিস্ট্রেট সরকারী উকিল (পিপি)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনার কিছু বলার আছে কি? তিনি বললেন, যেহেতু আসামীদের নামে তদন্তকারী কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছেন, সেহেতু তাঁদের যামিনের ক্ষেত্রে আমার কোন আপত্তি নেই। তখন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম ২০ মিনিটের জন্য মুলতবী করে নিজের রুমে চলে গেলেন। কিন্তু রুম থেকে প্রায় ১ ঘন্টা পরে এসে তিনি আমাদের যামিন মঞ্জুরের আদেশ শুনালেন। আদেশ শুনে একদিকে আনন্দে ও অপরদিকে দুঃখে আমরা চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর ধরে বিভিন্ন চেষ্টা-তদবীর করে বার বার যামিন ধরেও যারা আমাদেরকে যামিন দেননি, সেই তারাই আজ আমাদের মধ্যে এমন কি পেলেন যে, কারাগার থেকে এক প্রকার ডেকে এনে যামিন দিচ্ছেন? আযীযুল্লাহ বলল, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন সরকারী চক্রান্ত আছে। যাতে আমরা সরকারী লেজুড় হই, তার চেষ্টা চলছে। যাইহোক আল্লাহ যা করেন বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন। যা আমরা পরে বুঝেছি।

আমাদের শংকা :

মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে যেদিন আমাদের থেকে পৃথক করে বগুড়া জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হ'ল, সেদিন থেকেই আমার অন্তরে কি যেন এক অজানা শংকা কাজ করত। জেল জীবনের বয়স প্রায় ষোল মাসের কোঠায়। দু'একটি মামলায় যামিন হচ্ছে আর এমন সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পৃথকীকরণ আমার হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। দিনমণির গতি যখন মন্থর, এর আলোকরশ্মি যখন নিস্তেজের পথে, নীড়হারা পাখী, বাসাছাড়া পশুপ্রাণী যখন স্ব স্ব বাসার দিকে প্রবল বেগে ছুটছে, তখন আমাদের চৌদ্দ শিকের বন্দিকোঠায় আবদ্ধের ঘণ্টা বাজছে। পাহারাদার বাবু

সেকালের পিতলের এক বিরাট তালা হাতে নিয়ে ঘোষণা দিল, আপনারা ভিতরে ঢুকুন ৫-টা বেজে গেছে। এখনি গুনতি দিতে হবে। যা ভাবনা শিকের ভিতরে গিয়ে ভাবুন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভিতরে গিয়ে শিক ধরে দাঁড়িয়ে ভাবছি, 'যাঁর চিন্তা-চেতনা বাস্তবায়নের শরীক হিসাবে এ জেলখানায় আগমন, যাঁর শ্লোগান 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'; যার আহ্বান 'আমরা চাই, এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ, থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ' তাঁকে আমাদের থেকে পৃথক করল কেন? সরকারের কি কোন দূরভিসন্ধি আছে, নাকি ক্রস ফায়ারের কৌশল আঁটছে?

বাড়ীর চিঠি :

অতীতের বহু স্মৃতি মনে পড়ছে আর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরছে। এমন সময় সুবেদার গোলাম হোসাইন ছাহেব এসে বললেন, আপনার দু'টি খুশীর খবর। এক- মুহতারাম আমীরে জামা'আত বগুড়ায় ভাল আছেন। দুই- এই নিন আপনার বাড়ী থেকে আগত চিঠি। খাম খোলা। জেলখানার নিয়ম হ'ল, পোষ্ট কার্ডে লিখতে হবে। নইলে খাম খুলে জেলার ছাহেব চিঠি পড়ে অনুমোদন দিলে প্রাপকের হাতে পৌঁছবে। যদি আইন বিরোধী কিছু লেখা থাকে, তবে তা প্রাপকের হাতে দেওয়া হবে না। আযীযুল্লাহকে বললাম, বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, পড়ছি শোন-

'পাকজনাবেষু, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহপাকের ইচ্ছায় ভাল থেকে পরকালের পাথেয় জোগাড় করার জন্য ইহকালের কষ্ট ধৈর্যের সাথে বরণ করে নিচ্ছেন। আমি স্বপ্নে দেখেছি, আপনারা অতি তাড়াতাড়ি যামিনে মুক্তি পেয়ে যাবেন। চিন্তা করবেন না। আমরা সবাই ভাল আছি। বড় ছেলে 'রুছাফী' সাতক্ষীরা বাঁকাল মাদ্রাসা থেকে ৮ম শ্রেণী পাশ করে ঢাকার বংশাল মাদরাসায় ভর্তি হ'তে গিয়েছে। বাড়ীতে থাকলে পুলিশ হয়রানি করতে পারে। তাই ঢাকায় দিলাম। বড় মেয়ে 'নুছরাত' আম্মাপারা মুখস্থ করেছে। ওর বয়স এখন ছয় বছর। সে এবার প্রথম শ্রেণীতে ১ম হয়ে ২য় শ্রেণীতে উঠলো। ছোট মেয়ে 'নিশাত' এর বয়স এখন তিন বছর। লাল জুতা পায়ে দিয়ে সারা পাড়া ঘুরে বেড়ায়। আর আব্বা আব্বা বলে ডাকাডাকি

করে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তোমার আব্বা কোথায় গেছে? সে বলে, রাজশাহীতে জান্নাত কিনতে গেছে। এরপর দৌঁড়ে বাড়ী ফিরে এসে আমাকে বলে, আম্মা জান্নাতে কি কি পাওয়া যায়? আমি বলি, আঙ্গুর, আপেল, কমলা ইত্যাদি সুস্বাদু ফলমূল। সে প্রায়ই প্রশ্ন করে, আম্মা! জান্নাত কিনতে কত দিন লাগে? আমি বলি, ভাল জান্নাত কিনতে সময় বেশী লাগে। তোমার জন্য অনেক ভালো ভালো জিনিস আনবে তো, তাই সময় বেশী লাগছে। তুমি কারো বাড়ী যেয়ো না। কখন হয়তো তোমার আব্বা এসে পড়বেন, তখন তিনি তোমাকে পাবেন না। ইদানীং নিশাতের আব্বা আব্বা ডাক খুব বেশী হয়েছে। তাই বিশ্বাস আরো প্রবল হয়েছে যে, আপনাদের বের হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমীরে জামা‘আত, সালাফী ছাহেব ও আযীযুল্লাহ্‌র বাড়ীর খবর ভাল। আমি তাঁদের বাড়ীতে ফোনে যোগাযোগ করেছি; তাদের সাথে কথা বলেছি। বিবিসির খবরে শুনলাম, মুহতারাম আমীরে জামা‘আতকে নওগাঁ কারাগার থেকে বগুড়া কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখন আপনারা ওখানে সাময়িক সময়ের জন্য অভিভাবকহীন হয়ে গেলেন। তবে আমীর শূন্য হননি। তিনি যে উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি পালন করার চেষ্টা করবেন। বের হওয়ার জন্য উদগ্রীব হবেন না। জেলখানার একটি দানা আপনাদের জন্য বরাদ্দ থাকতে আপনারা বাইরে আসতে পারবেন না। জেলখানা আমল, আক্বীদা ও ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নিরিবিলি স্থান। কবি ইকবালের একটি কথা মনে পড়ে, ‘ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায়, হর কারবালাকে বা‘দ’। আপনারা জেলখানায় যাবার পর থেকে এমন কোন মিডিয়া নেই, যেখানে ‘আহলেহাদীছ’-এর কথা শোনা যায় না। ‘আহলেহাদীছ’ শব্দটি এত ব্যাপক প্রচার হচ্ছে যে, আপনারা যখন নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে বেরিয়ে আসবেন, তখন এই প্রচার আমাদের সংগঠনের জন্য সহায়ক হবে *ইনশাআল্লাহ*। আর নয়! অনেক কথা লিখলাম, দো‘আ করবেন, যাতে ধৈর্যের সাথে ঈমান ও আমল নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি। ইতি- আন্দোলনের সাথী- আঞ্জুমান আরা। তাং ৫.৬.২০০৬ইং।

আমার চিঠি পড়া শেষ না হ’তেই সালাফী ছাহেব ডেকে বললেন, আসুন খাবার রেডি, এক সাথে খেয়ে নেই। সালাফী ছাহেব ভাগ-বাটোয়ারায় খুব পাকা। যেকোন জিনিস সুন্দর করে ভাগ করে দিতে পারেন। নিজে না খেয়ে

অপরের থালায় তুলে দিতেই তিনি বেশী আনন্দ বোধ করতেন। তাই প্রত্যেক দিন তিনিই প্রতিটি খাবার ভাগ করে আমাদের ডেকে খাওয়াতেন।

ঔষধ নয়, ব্যায়াম রোগ নিরাময়কারী :

মুহতারাম আমীরে জামা'আত নওগাঁ কারাগার থেকে বগুড়া কারাগারে চলে যাওয়ার পর থেকে আমাদের মধ্যে কিছু অনিয়ম দেখা দিল। খাওয়া, ঘুম, ব্যায়াম কিছুই নিয়মতান্ত্রিকভাবে হ'ত না। ফলে আমার ডান পায়ের পাতা থেকে কোমর পর্যন্ত মোটা রগটি টেনে ধরতে লাগল। চরম ব্যথা। কারাগারের ডাক্তার বিভিন্ন ঔষধ দিল, নিরাময় হ'ল না। ফলে কারা কর্তৃপক্ষ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে নিওরোলজিষ্ট নিয়ে আসলেন। তিনি আমাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর একটি ব্যায়াম শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন, তিন দিনের মধ্যে আরাম বোধ করবেন। ব্যায়ামটি হ'ল (১) 'শক্ত বিছানায় চিত হয়ে মৃত মানুষের মত টান টান হয়ে শুতে হবে। তারপর সমস্ত শরীর বিছানায় ঠিক রেখে শুধু ডান পা এক ফুট পরিমাণ উঁচু করে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গুনতে হবে। পঞ্চাশ গোনা শেষ হ'লে ডান পা নামিয়ে বাম পায়ের উপরও ঐ নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে। অতঃপর (২) পৃথক পৃথক ভাবে দুই পা শেষ করে দুই পা একত্রিত ভাবে এক ফুট পরিমাণ উঁচু করে কোমর বিছানায় ঠিক রেখে ঐ পঞ্চাশ গণনা পরিমাণ সময় ব্যয় করতে হবে। এরপর দুই পা নামাতে হবে। এরপর (৩) শোয়া অবস্থায়ই দুই হাত দিয়ে ডান হাঁটু ভাজ করে বুকের সাথে যতদূর পারা যায় চেপে ধরতে হবে এবং পঞ্চাশ গণনার পরিমাণ সময় ব্যয় করতে হবে। ডান হাঁটুর পর বাম হাঁটু একই নিয়মে চলবে। তারপর (৪) শোয়া অবস্থায় দুই হাত দিয়ে ঘাড় চেপে ধরে যতটুক পারা যায় বুকের দিকে আনতে হবে। সর্বাবস্থায় পঞ্চাশ পর্যন্ত গণনার সময় নিতে হবে। এভাবে (৫) সকাল-সন্ধ্যা দশ বার করে ব্যায়াম করলে সাইটিকার মত বাত-বেদনাও সেরে যাবে *ইনশাআল্লাহ*।

ডাক্তারের কথা মত দুই দিনেই আরাম পেয়ে গেলাম। আমাদের পাশের রুমেই থাকতেন সিভিল সার্জন ডাঃ নূরুল ইসলাম। তিনি আমার ব্যায়াম দেখে বলতেন, ঔষধ নয় ব্যায়ামেই নিরাময়।

সুবেদার গোলাম হোসাইন :

আমরা যেদিন প্রথম নওগাঁ কারাগারে আসলাম, সেদিন আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন সুবেদার গোলাম হোসাইন। ব্যাগ-ব্যাগেজ আমাদের হাত থেকে নিয়ে অন্য কয়েদীর হাতে দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ওনারা প্রফেসর ডঃ গালিব স্যারের সাথী। ওনাদের দক্ষিণ দিকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আলো-বাতাসপূর্ণ নতুন সেলে নিয়ে যাও। নতুন কম্বল, থালা-বাসন সহ সবকিছুর সুন্দর ব্যবস্থা করে দাও।

সুবেদারের পরিচয় :

পরের দিন সময় করে এসে তার জীবন বৃত্তান্ত শুনালেন। জন্মস্থান সিরাজগঞ্জ। বর্তমানে বগুড়া শহরে বাড়ী করেছেন। ছোটতেই পিতৃহারা। পরের বাড়ীতে মানুষ। অষ্টম শ্রেণী পাশ করে পুলিশের সহযোগিতায় জেলখানার কারারক্ষী (বাবু) পদে চাকুরী নেন। দিনে চার ও রাতে চার মোট আট ঘণ্টা ডিউটি। কয়েদী পাহারা দেওয়া আর বিদ্যুতের খুঁটির নিচে দাঁড়িয়ে বই পড়া। এভাবে মেট্রিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে পাশ করেন তিনি। অতঃপর আই.এ, ও বি.এ পাশ করে বর্তমানে জেলখানার সুবেদার পদে চাকুরীরত। এ সম্মান আল্লাহ তাকে দান করেছেন প্রবল ইচ্ছাশক্তি, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের কারণে, বললেন তিনি। জেলখানার ভিতরে যা কিছু দেখছেন, সব আমার আসার পর নিজ হাতে সাজানো। আমার জন্য দো'আ করবেন- যাতে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি।

সুবেদার ছাহেব আমীরে জামা'আতকে অত্যধিক সম্মান করতেন। আমীরে জামা'আত বগুড়া চলে যাওয়ার পরেও আমাদের প্রতি তার ভক্তি-শ্রদ্ধায় এতটুকুও কমতি হয়নি। একদিন সকাল বেলা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে হেসে হেসে বলছেন, 'চারিদিকের আবহাওয়ায় বলছে আপনারা বেশীদিন এখানে থাকবেন না। দীর্ঘদিন আমীরে জামা'আতের সাথে মিশে এবং গতকাল বগুড়া জেলখানায় ওনার সাথে দেখা করে ওনার 'থিম' (Theme) আমি বুঝতে পেরেছি। উনার 'আন্দোলন' নির্দিষ্ট কোন গ্রুপের আন্দোলন নয়, বরং সকল আদম সন্তানকে জান্নাতের পথ দেখানোর আন্দোলন। ইনশাআল্লাহ এদেশে আপনাদের দেখানো পথেই শান্তি আসবে,

এটা আমার একান্ত বিশ্বাস। কেননা অন্যদের আন্দোলন হ'ল সরকার পরিবর্তনের আন্দোলন। আর ওনার আন্দোলন হ'ল মানুষ পরিবর্তনের আন্দোলন। যা সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে পরিবর্তন আনে। সরকার অস্থায়ী। কিন্তু এটা স্থায়ী। রাজনীতির পরিভাষায় এটাকে বলে সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন। সেটা বুঝতে পেরেই কথিত ইসলামী মূল্যবোধের সরকার ওনাকে জেলে বন্দী করেছে। ওনাকে দেখে এসে রাত্রিতে বসে অনেক চিন্তা করেছি। পরে চার লাইন কবিতা লিখেছি। আপনি তো বেশ কয়টি কবিতা লিখেছেন। তাই এর সাথে মিল করে আরও কয়েকটা লাইন লিখে আমাকে দিবেন।-

গতকাল আমি দেখে এলাম
ড. গালিবকে বগুড়ার জেলে,
না জেনে অনেকে মহাজনদের
পিছনে অনেক কথা বলে।
কেউ বলে ড. গালিব
একাই নিয়েছেন ঝুঁকি
ধর্মান্ধদের পথ দেখাতে,
তাঁর সাথীদেরও লক্ষ্য একই *(গোলাম হোসেন)*।
কেউ বলে অনাচার আর
দুর্নীতির এই দেশে,
সূদ-ঘুষ যুলুম-নির্যাতন
সমাজে গেছে মিশে।
ধর্মে-বর্ণে মানুষের মাঝে
দ্বন্দ্ব হয়েছে বেশী,
খুন-খারাবী বোমাবাজী
ঘটিতেছে দিবানিশি।
শক্তিমানের আগ্রাসনের
এ অশান্ত কলিকালে,

ড. গালিব গড়িবে স্বর্গরাজ্য
সইবে কি দেশের ভালে?
প্রশ্ন তোমার যতই থাকুক
কাজ কর মনেপ্রাণে,
সহসা দেখিবে ভ্রমর জুটিবে
সততার সুঘ্রাণে।
তুমি কি দেখনি সাহারা মরুতে
বাতিলের হুংকার,
নিমেষে নিভিল গর্জে উঠিল
তাওহীদী ঝংকার।
সৎ মানুষের ঈমানী পরশে
বদর প্রান্তর থেকে,
ভাগিল বেদ্বীন স্থায়ী হ'ল দ্বীন
গায়েবী মদদ দেখে।
সুনীতি যাদের জীবনের ব্রত
নেই তাদের পরাজয়,
জীবনে মরণে প্রভুর স্মরণে
হবেই তাদের মহা জয়।

পরের দিন সুবেদার ছাহেব এসেই বললেন, কই আপনার কবিতা? আমি বালিশের নীচ থেকে কাগজটি বের করে উপরোক্ত কবিতা শুনিয়ে দিলাম। সুবেদার ছাহেব ধন্যবাদ জানিয়ে আরো লেখার জন্য উৎসাহ দিয়ে চলে গেলেন।

নওগাঁ নতুন জেলখানার বিবরণ :

১৭ বিঘা জমির উপর ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এই জেলখানা তৈরী হয়েছে। জেলখানাটি খুবই সুন্দর। তবে বাইরে বা ভিতরে সরকারীভাবে তৈরী কোন মসজিদ নেই। আমীরে জামা'আতকে সুবেদার ছাহেব এখানে একটি পাকা মসজিদ নির্মাণের অনুরোধ করেছিলেন। ১৪ই মার্চ'০৫ প্রথম দিন আমরা জেল

গেইটে ঢুকেই ভিতরে তাকিয়ে দেখি, নয়নাভিরাম এক সুন্দর ফুল বাগান। সুন্দর পরিচ্ছন্ন রাস্তা। তারপর 'কেইস টেবিল'। অর্থাৎ পাকা ছাদযুক্ত ছোট একটি খোলা ঘর। যেখানে সাধারণতঃ সুবেদার ছাহেব বসেন। চৌকার রান্না করা খাবার প্রথমে এখানে আসে। পরে সুবেদার স্বাদ আস্বাদন করে অনুমোদন দিলে সেটা বন্দীদের নিকট পরিবেশন করা হয়। তাছাড়া এখানে বসে সশ্রম কারাবন্দীদের দৈনন্দিন কর্মবণ্টন হয়। অবাধ্যদের শাস্তি দেওয়া হয়। বিচার-শালিশও করা হয়। এজন্য একে 'কেইস টেবিল' বলা হয়। যেদিন আমীরে জামা'আত এখানে আসেন, সেদিন প্রথমেই তাঁর নযর পড়ে দেওয়াল লিখনের প্রতি। সেখানে ও অন্যান্য দেওয়ালগুলিতে অনেক উপদেশবাণী লেখা আছে। উনি অনেক বানানে ও বক্তব্যে ভুল ধরেন। যেমন 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়'। আমীরে জামা'আত বললেন, তাহ'লে আপনারা পাপীদের শাস্তি দেন কেন? পাপ থেকে পাপীকে পৃথক করা যায় কি? জেলখানায় তাহ'লে পাপগুলি রেখে আপনারা আসামীদের ছেড়ে দিন'। জেলার ও সুবেদার থ' হয়ে শুনতে থাকল। অতঃপর বলল, স্যার! দীর্ঘ চাকুরী জীবনে কত মন্ত্রী ও নেতাদের দেখেছি, কিন্তু কেউ এভাবে আমাদের ভুল ধরে দেয়নি।

দু'দিকে দু'টি রাস্তা ওয়ার্ডগুলির দিকে চলে গেছে। রাস্তার দুই ধারে হরেক রকম ফুলের বাগান। তার মাঝে বিশাল মাঠে সবজির চাষ। মূল গেইট থেকে দক্ষিণের রাস্তা ধরে আমাদের নিয়ে গেল সর্ব দক্ষিণের নিরিবিলি ৫ কক্ষ বিশিষ্ট একটি সেলে। দক্ষিণ মুখী, পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা উক্ত সেলের সর্ব পশ্চিমের রুমটি আমাদের জন্য বরাদ্দ। ঢুকেই দেখি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মোজাইক করা মেঝে ও টয়লেট। আছে ফ্যান, লাইট ও পানির সুন্দর ব্যবস্থা। সামনে দক্ষিণের ফাঁকা আঙিনায় মৃদুমন্দ হাওয়া। মনে হ'ল সুদূর পথ অতিক্রমকারী সম্মানিত অতিথির মাঝপথে বিশ্রামের জন্য সুন্দর রেষ্টহাউজ। কিছুক্ষণ পর হাসতে হাসতে সুবেদার ছাহেব এসে সালাম দিয়ে হাল-হকীকত জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর খাবারের ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। সুঠাম দেহ, সুন্দর চেহারার মানুষ তিনি। মিষ্টি হাসি দিয়ে আমাদেরকে আপন করে নিলেন।

যামিনে মুক্তি লাভ :

কয়েক যেলায় যামিন লাভের পর এবার গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানার মামলার পালা। সেই ২০০৫ সালের মার্চ মাসে রিম্যাণ্ড শেষ করে গোপালগঞ্জ থেকে আমাদের নিয়ে এসেছে। এরপর আমাদেরকে সেখানে আর নিয়ে

যায়নি। এখন সংবাদ পেলাম, আগামী ধার্য তারিখে ঐ মামলা থেকে আমাদেরকে অব্যাহতি না দিলেও যামিন দেওয়া হবে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। অনেকে বলছেন, এখানে যেহেতু আপনাদের আর কোন মামলা নেই, সেহেতু আপনারা গোপালগঞ্জে চলে যাবেন। তাহ'লে যেদিন যামিন হবে সেদিনই বের হ'তে পারবেন। তা না হ'লে ওখান থেকে যামিনের কাগজ নওগাঁয় আসতে আবার দু'চার দিন সময় লেগে যেতে পারে। আমরা বললাম, দেড় বছরের কাছে দু'চার দিন কোন সমস্যা নয়। আমাদের আশা আমরা নওগাঁ থেকেই বের হব। অবশেষে তাই হয়েছিল। নির্ধারিত দিন আসল।

সকাল থেকে আমরা অধীর আগ্রহে সংবাদ শোনার অপেক্ষায় আছি। সেলের গেটের দিকে বার বার তাকাচ্ছি কখন সুবেদার ছাহেব আসবেন। আর কখন তিনি সংবাদটা দিবেন। অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটল। বিহারী এসে বলল, সুবেদার স্যার আসছেন। তিনি গুটি গুটি পায়ে হেঁটে এদিকে ওদিকে না গিয়ে সরাসরি আমাদের সেলে আসলেন। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনাদের কপাল মন্দ। আমাদের চেহারাটা নিমেষেই মলিন হয়ে গেল। তারপরও মনে খুব জোর নিয়ে বললাম, হেঁয়ালি ছাড়েন, খবর বলেন। তখন সুবেদার বললেন, আপনাদের চারজনেরই আজকের মামলায় যামিন হয়ে গেছে। আমরা জোরে *আলহামদুলিল্লাহ* বলে উঠলাম। বললাম, তবে যে বললেন কপাল মন্দ? তখন তিনি বললেন, কপাল মন্দ না! এখানে এত আরামে আছেন, খাচ্ছেন, ঘুমাচ্ছেন। তাতো আর পারবেন না। আমরা ইচ্ছা করলেও আপনাদের আর আটকে রাখতে পারব না। রসিকতার ছলে এই কথাগুলো বলতে বলতে মনের অজান্তে কখন যে সুবেদার ছাহেবের চোখ পানিতে ভরে উঠেছে তা তিনি নিজেই বুঝে উঠতে পারেননি। যখন বুঝে উঠলেন, তখন তাঁর চোখের পানি আমাদের থেকে আড়াল করার জন্য অন্য কোন কথা না বলে দ্রুত সেল থেকে বের হয়ে চলে গেলেন। নিয়ম অনুযায়ী বিহারী আব্দুল জাব্বার পিছনে পিছনে গিয়েছিল। পরে এসে বলল, আপনাদের সেল থেকে বের হয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে স্যার চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন।

২৯.৬.২০০৬ইং তারিখে তরীকুযযামান, আব্দুর রশীদ আখতার ও আমার ছেলে আব্দুল্লাহ মারূফ রুছাফী নওগাঁ কারাগারে দেখা করতে এসে সমস্ত

কেসের খবর, দেশ ও সংগঠনের ভিতর-বাইরের বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ দেয়। সিরাজগঞ্জ ও নওগাঁ সহ অন্যান্য মামলায় যামিন হয়েছে জানিয়ে বলে, আগামী ২.৭.২০০৬ইং তারিখে গোপালগঞ্জের কাগজ আমরা হাতে পাব *ইনশাআল্লাহ*। ঐ দিন বিকালে কিংবা পরের দিন আপনারা রেডি থাকবেন। ৩ তারিখ সকাল থেকে মনের মধ্যে বিমর্ষভাব কাজ করছিল। সালাফী ছাহেব, আযীযুল্লাহ বিছানা-পত্র গুটিয়ে দীর্ঘ সাড়ে ১৬ মাসের জেল সংসারের আসবাবপত্র বিলিবণ্টন করতে আরম্ভ করল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ষোল মাসের স্মৃতিচারণ করছিলাম। সেদিন সালাফী ছাহেব বললেন, আমাদের নেতারা আগে আমীরে জামা'আতকে বের করে পরে আমাদের বের করবে। কিন্তু এখন আমীরে জামা'আতকে রেখে আমরাইতো আগে বের হচ্ছি। আমীরে জামা'আত বলেছিলেন, নূরুল ইসলাম! আমি আল্লাহকে বলেছি, 'হে আল্লাহ! আমাদের কোন কর্মীকে জেলে রেখে তুমি আমাকে মুক্তি দিয়ো না। দেখবে, তোমরাই আগে যামিন পাবে'। এখন দেখছি তাইতো হ'ল। ইত্যাদি নানান চিন্তা মনের কোণে ভেসে উঠছিল। বেলা যত বেশী হচ্ছে বাইরে যাওয়ার আগ্রহ তত বাড়ছে। কিন্তু কোন খবর হ'ল না। বিকাল হ'লে লকাপের ঘণ্টা বাজল, জেলগেট থেকে কোন খবর আসল না। সালাফী ছাহেব তো রাগে বকাবকি শুরু করে দিলেন। আমাদের মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সরকার আবার কোন ফন্দি-ফিকির করছে কে জানে? আমি তো বলেই ছিলাম যে, আমীরে জামা'আতের যামিন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের যামিন হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। সেদিনের মত মন খারাপ করে হাযারো ভাবনা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর তিন চার দিনের মধ্যে কোন খবর নেই। না চিঠিপত্র, না দেখা-সাক্ষাৎ, না সুবেদার ছাহেব। মুক্তির আশা একরকম ছেড়ে দিয়েই দিন কাটাতে লাগলাম।

প্রতীক্ষায় থাকলাম। কখন আসবে গোপালগঞ্জ থেকে নওগাঁ কারাগারে আমাদের মুক্তির আদেশপত্র! অবশেষে সুবেদার ছাহেব আসলেন আমাদের সেলে। বললেন, কমপক্ষে ৩ দিন সময় লাগবে। নিশ্চিত মুক্তির সংবাদ পেয়ে এই কয়দিন আমরা নির্ঘুম সময় কাটিয়েছি। নানা রকম চিন্তা মাথায় এসে জমা হ'ত। গ্রেফতার হ'লাম চারজন; কিন্তু বের হচ্ছি তিনজন। আমীরে জামা'আত কবে বের হবেন, কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। আমরা বের হওয়ার সাথে

সাথে আমাদের উপর চেপে বসবে বড় বড় দু'টি দায়িত্ব। একটি হ'ল সংগঠনের দায়িত্ব, আরেকটি হ'ল আমীরে জামা'আতের মুক্তির দায়িত্ব। অপরদিকে আযীযুল্লাহও এখন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি। সেও বলছে, ভাই আগে অন্যের অধীনে থেকে কাজ করেছি, এখন আমাকেই অন্যের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। তার উপর সংগঠনের এই নাযুক পরিস্থিতি। তাকেও বিভিন্ন উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা বলে সান্ত্বনা দিচ্ছি, অভয় দিচ্ছি। এমনিভাবে নানা রকম চিন্তা করতে করতে কখন যে সময় পার হয়ে মুক্তির শুভক্ষণ উপস্থিত হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি।

৯ই জুলাই'০৬ রবিবার দুপুর ১-টা। সুবেদার ছাহেব এসে বললেন, নওগাঁ আদালত হয়ে আপনাদের মুক্তির আদেশ আমাদের জেল সুপারের কাছে চলে এসেছে। সুতরাং আপনারা গোছগাছ করে নিন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের নেওয়ার জন্য বাইরে কি কেউ এসেছে, নাকি আমাদের একা একা যেতে হবে? সুবেদার ছাহেব এব্যাপারে খোলাছা করে কিছুই বললেন না। বুঝতে পারলাম, আমাদের চলে যাওয়ার বিষয়টা তাঁর মনও সহজভাবে মেনে নিচ্ছে না। কিন্তু ঐ যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যেতে নাহি দেব হায়! তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়'। নিজেরা বলাবলি করলাম, অবশ্যই কেউ না কেউ এসেছে, চিন্তার কোন কারণ নেই। প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম। যেসব জিনিস বাইরে এসে তেমন প্রয়োজন নেই, সেসব জিনিস আগে থেকেই যাকে যা দেওয়া যায়, তাকে তা দিয়ে বোঝা কমিয়ে ফেলেছি। এখন যেগুলো নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল সেগুলো গোছগাছ করার পালা। আযীযুল্লাহ তার পি.এইচ.ডির বিষয়ে পড়ার জন্য যেসব বই কারাগারে এনেছিল, সেগুলো সুন্দর করে বেঁধে নিল। আমরাও পড়ার জন্য যেসব বই এনেছিলাম তাও গুছিয়ে নিলাম। একে একে আমাদের গোছগাছ শেষ হ'ল। এদিকে সুবেদার ছাহেব আমাদের জিনিসপত্রগুলো সেল থেকে কারাগারের গেট পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কয়েকজন কয়েদীকে ডেকে এনেছেন। আর আব্দুল জাব্বার বিহারী তো আছেই। সেল থেকে আমরা যখন বের হচ্ছিলাম, তখন সেখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হ'ল। সেলের প্রায় সকল বন্দীর চোখে পানি। অনেকে সশব্দে কেঁদে ফেললেন। ঐ পরিবেশ থেকে বের হয়ে আসতে আমাদেরও খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু কিছুই করার নেই। সেলের কারারক্ষী,

হাজতী, কয়েদী, ফাঁসির আসামী সকলের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে মুছাফাহা করে বিদায় নিলাম। পেছন ফিরে দেখলাম, সকলেই এক দৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

সেদিন দুপুরের খাবার খেতে কেন যেন ভাল লাগছিল না, তাই বিলম্ব হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সকালের বাবুদের ডিউটি পরিবর্তন হয়ে বিকালের বাবু এসে আমাদের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চেয়ে বললেন না। শুধু জানালেন বাইরে অনেক আলেম-ওলামা টুপি-দাড়ীওয়ালা মানুষ সকাল থেকে ভীড় করে আছে। ভাবলাম কোন মহৎ ব্যক্তির হয়তো জেল হয়েছে, তাকে কোর্ট থেকে আনছে তাই এত ভীড়। আযীযুল্লাহ আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, আরে ভাই আমাদেরও তো হ'তে পারে? এদিকে সালাফী ছাহেব রেগে রেগে বলছেন, রাখুন ওসব চিন্তা-ভাবনা। বিকাল ৩-টা বাজতে গেল, এখনো দুপরের খাবার খেলেন না, তাড়াতাড়ি আসুন। তিনি তিনজনের থালাতে ভাত তুলে দিয়ে তরকারী দিচ্ছেন। আমি হাত ধুয়ে ভাতে হাত দিয়েছি, এমন সময় দ্রুতপায়ে সুবেদার ছাহেব এসে বললেন, এখুনি রেডি হৌন! আপনাদের যামিনের কাগজ তৈরী হয়ে গেছে। সকাল থেকে আপনাদের সংগঠনের লোকজন এসে ভীড় জমিয়ে বসে আছে। চলুন আমার সাথে। থালার ভাত থালাতেই থাকল, হাতের ভাত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শুধু পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে দীর্ঘ সাড়ে ১৬ মাসের কারাজীবনের গোছানো সংসার অন্যান্য কয়েদীদের হাতে তুলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে জেল গেইটে এসে হাযির হ'লাম।

আমরা মুক্তি পাচ্ছি এ সংবাদ কারাগারের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এক নযর দেখার জন্য সবারই লক্ষ্য কারাগারের প্রধান ফটকের দিকে। আমরা বের হওয়ার সাথে সাথে চৌকায় কর্মরত কয়েদীরা দূর থেকে হাত নেড়ে আমাদেরকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় জানাল। এরপর সেল থেকে কারাগারের প্রধান ফটক পর্যন্ত হেঁটে আসার সময় দূরের ওয়ার্ডগুলো থেকে এবং মেডিকেল ওয়ার্ড থেকে একইভাবে হাজতী-কয়েদী ও কারারক্ষী ভাইয়েরা হাত নেড়ে বিদায় জানালো।

সুবেদার ছাহেব আমাদের সঙ্গে আছেন। কিন্তু কোন কথা বলছেন না। মাথা নীচু করে হাঁটছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তিন মিনিটের পথ যেন তার কাছে

তিন ঘণ্টার পথ হয়ে গেছে। মেইন গেটে এসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কারারক্ষীকে ইশারায় গেট খুলতে বললেন। মুখে বললে, যদি আমরা কিছু বুঝে ফেলি? গেট খোলা হ'ল, আমরা অফিসে প্রবেশ করলাম। আমাদের জিনিসপত্রগুলো ইতিমধ্যে বিধি মোতাবেক গেটে নামমাত্র চেকিং হয়ে বাইরে আমাদের লোকদের কাছে পৌঁছে গেছে। অফিসে আমাদের সকলের স্বাক্ষর নিয়ে অফিসিয়াল নিয়ম-কানূন সমাপ্ত হ'ল। সুপার, জেলার, ডেপুটি জেলার ও ফার্মাসিস্টসহ উপস্থিত সকলের সাথে মুছাফাহা করে আস্তে আস্তে আমরা কারাগারের বাইরের গেটের দিকে অগ্রসর হ'লাম। এবার সুবেদার ছাহেব কারারক্ষীকে ইশারা না করে মুখেই মেইন গেট খোলার নির্দেশ দিলেন। ইতিমধ্যে হয়তো তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা সামলাতে পারিনি। তাকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানিতে শুকরিয়া জানালাম। তিনিই ছিলেন কারাজীবনে আমাদের বড় হিতাকাঙ্ক্ষী। আল্লাহ তাঁকে এর সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন- আমীন!

অতঃপর বিকেল ৫-টায় বাইরের গেইট খোলা হ'ল। গেইটের বাইরে এসে যেটা দেখলাম সেটা আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমরা ভেবেছিলাম, আমাদের নিতে হয়তো রাজশাহী এবং নওগাঁর কিছু নেতা-কর্মী আসতে পারেন। কিন্তু বাইরে এসে দেখি কয়েক শত মানুষ আমাদের নেওয়ার জন্য চত্বরে ও রাস্তায় উপস্থিত। খুশীতে আমাদের চোখগুলি ছলছল করে উঠল। আমাদের দেখা মাত্র সকাল থেকে চাতকের মত অপেক্ষমাণ জান্নাত পিয়াসী কর্মী ভাইদের দু'গণ্ড বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। সালাম-মুছাফাহা করতে করতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো কর্মীদের দুই লাইনের সরু পথ দিয়ে দূরে দাঁড়ানো মাইক্রোর দিকে এগিয়ে চলছিলাম। তখন আমীরে জামা'আতকে একাকী জেলখানায় রেখে বের হওয়ার বেদনায় আমার দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট, রাজশাহী, মেহেরপুর থেকে যেলা কর্মপরিষদের দায়িত্বশীল, সাতক্ষীরা থেকে আযীযুল্লাহ্র আত্মীয়-স্বজন সহ যেলার দায়িত্বশীলবৃন্দ, কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল এবং নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্রদের তিনটি মাইক্রো সিরিয়াল করে রাখা আছে। তাদের আবেদন তিন মাইক্রোতে তিন জনকে উঠতে হবে। আমি সিদ্ধান্ত দিলাম আমরা তিন জন এক মাইক্রোতে রাজশাহী মারকায পর্যন্ত যাব।

অতঃপর আমরা মাইক্রোতে উঠলাম। এরপর অন্যেরা যার যার রিজার্ভ গাড়িতে উঠল। আস্তে আস্তে সকল গাড়ি লাইন দিয়ে রাস্তায় উঠে গেল। এমনিভাবে আমরা তিনজন আমাদের ১ বছর ৪ মাস ১৪ দিনের কারাজীবনের অবসান ঘটিয়ে ৯ই জুলাই'০৬ রবিবার মুক্ত জীবনে ফিরে এলাম। অতঃপর ২৫টি মাইক্রো, ৩০/৩৫টি মটরসাইকেল ও বাসের বিশাল বহর আমাদেরকে নিয়ে রাজশাহী মারকাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল *(আত-তাহরীক, ৯/১১ সংখ্যা, আগস্ট'০৬ পৃঃ ৪৪)*।

সাড়ে ১৬ মাস পূর্বে মিথ্যা মামলার আসামী করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার যে হীন চক্রান্তে আমাদেরকে মারকায থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, সেই 'দারুল ইমারত' হবে আমাদের প্রথম অবতরণ স্থল। অতঃপর আমরা ছহীহ-সালামতে বাদ মাগরিব মারকাযে এসে উপস্থিত হ'লাম। সেখানে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান ভারপ্রাপ্ত আমীর ড. মুছলেহুদ্দীন, আত-তাহরীক সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সেই সাথে ছিল অসংখ্য নেতা-কর্মী ও শত মানুষের ঢল। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ*।

নওগাঁর বাকী কিছু ঘটনা :

নওগাঁ রাণীনগর থানার খেজুর আলী হত্যা মামলায় আমরা এফআরটি পেলেও বাদীনী নারাযী দেওয়ার কারণে আমাদেরকে যামিনে বাইরে থেকেও মামলার দিন হাযিরা দিতে হ'ত। একদিন আমীরে জামা'আত, আমি ও আযীযুল্লাহ হাযিরা দিতে গেছি। কাঠগড়ায় উঠার সময় এক পুলিশ সবার জুতা খুলতে বলল। আমীরে জামা'আত তার দিকে গরম নযরে তাকালেন। তাতেই সে পিছিয়ে গেল। বিচারক তাকিয়ে থাকলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। উকিল বললেন, এটাই নাকি এই আদালতের নিয়ম। অতঃপর অপর কাঠগড়া হ'তে বাদীনী আমাদের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বিচারকের উদ্দেশ্যে বললেন, এই হুযূররাই আমার স্বামীকে হত্যা করেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি'। জবাবে আমাদের উকিল কিছু বলার আগেই বাদী পক্ষের উকিল দাঁড়িয়ে বললেন, মাননীয় আদালত! আমার বাদীনী পাগল হয়ে গেছেন। উনার কথা লিখবেন না' বলেই বসে গেলেন। অতঃপর আমরা নেমে এলাম। এর পরের তারিখেই আমরা ঐ মামলা থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম।

এদিন মামলায় হাযিরার জন্য আমরা উকিলের কাছে বসে আছি। এমন সময় আমাদের যেলা সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন দূরে দাঁড়ানো একজন ব্যক্তির দিকে ইশারা করে বললেন, উনি স্যারকে আজ দুপুরে তার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়াতে চান। উনি স্যারের অত্যন্ত ভক্ত। অতঃপর নিশ্চিত হয়ে স্যার তার দাওয়াত কবুল করলেন। এরপর আদালতে হাযিরা শেষে আমরা তার বাড়ীতে গেলাম। খাওয়ার সময় তিনি যা বললেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর।

তিনি বললেন, স্যার যখন এ্যারেস্ট হন, তখন আমি রাজশাহী ডিজিএফআইয়ের গোয়েন্দা শাখায় সার্জেন্ট পদে কর্মরত ছিলাম। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হ'ল, স্যারের বিষয়ে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। আমি সাধ্যমত তদন্ত করে উপরে রিপোর্ট পাঠালাম। কিন্তু পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হ'ল। ফলে আমি সরেযমীনে আরও ভালোভাবে তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠালাম। কিন্তু এবারও পুনঃ তদন্তের নির্দেশ এল। তখন আমি সাথীদের বললাম, ব্যাপারটা কি? তাদের একজন বলল, আপনি রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আ পড়েন কেন? আমি বললাম, সে তো মাঝে-মধ্যে পড়ি। এরপরেই আমাকে ঢাকায় হেড কোয়ার্টারে ওএসডি করা হ'ল এবং কড়া নযরদারীতে রাখা হ'ল। কিছুদিন পর আমাকে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে সরিয়ে বেজ ইউনিটে ফেরৎ আনা হয় এবং রংপুরে ট্রান্সফার করা হয়। এতে ক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ করলে একজন সাথী বললেন, বাঁচতে চাইলে মেনে নিন। নইলে 'হাওয়া' হয়ে যাবেন, খোঁজ পাওয়া যাবে না। তখন আমি আল্লাহকে বলি, একজন নির্দোষ আলেমের পক্ষে রিপোর্ট দেওয়ায় আমার এই অবস্থা হ'ল। আল্লাহ তুমি এর উত্তম বদলা দিয়ো'।

অতঃপর আমি চাকুরী শেষে বাড়ী আসি এবং এখন নওগাঁ শহরে জমি কিনে দো'তলা বাড়ী করেছি। তখন থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল, যার জন্য আমার জীবনে এই ছন্দ পতন, তাঁকে আমার বাড়ীতে এনে খাওয়াব এবং তাঁর দো'আ নেব। আজ আমার সেই আশা পূরণ হ'ল। *আলহামদুলিল্লাহ*।

উল্লেখ্য যে, ওয়াসীমুদ্দীন নামের উক্ত ভুক্তভোগী ভাইটি বর্তমানে নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মপরিষদ সদস্য (২০১৫-১৭ইং সেশন)। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

মামলা সমূহের বিবরণ

১. রাজশাহী মহানগরীর শাহ মখদূম থানায় ২৩.০২.২০০৫ইং তারিখে ৫৪ ধারায় মামলা। বিবাদী (১) ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (২) আব্দুস সামাদ সালাফী (৩) মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (৪) এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। এফআরটি (প্রাথমিক তদন্তে খালাস) ০৯.০৪.২০০৫ইং।

২. সিরাজগঞ্জ যেলার উল্লাপাড়া থানায় ১৬.০২.২০০৫ তারিখে নেওয়ারগাছা গ্রামীণ ব্যাংকে ডাকাতি মামলা। এসটি (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) ৪৫/০৫। বিবাদী ৪ জন। এফআরটি ০৪.০৭.২০০৫ইং।

৩. গাইবান্ধা যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানায় ১১.০২.২০০৫ তারিখে মহিমাগঞ্জ ব্রাক ব্যাংক অফিসে ডাকাতি। এসটি ২২/০৫। বিবাদী ৪ জন। এফআরটি ২৬.০৭.২০০৫ইং।

৪. নওগাঁ যেলার পোরশা থানায় ১৬.০২.২০০৫ তারিখে ব্রাক ব্যাংক অফিসে ডাকাতি। এসটি ৪৮/০৫। বিবাদী ৪ জন। এফআরটি ১৩.১১.২০০৫ইং।

৫. গোপালগঞ্জ যেলার কোটালীপাড়া থানায় ১৮.০১.২০০৫ তারিখে ব্রাক ব্যাংক অফিসে ডাকাতি। সেশন ৩৬/০৬। বিবাদী ৪ জন। এফআরটি ০৫.১১.২০০৬ইং।

৬. গাইবান্ধা যেলার পলাশবাড়ী থানায় ২৬.১২.২০০৪ তারিখে তোকিয়ার বাজার যাত্রা প্যাণ্ডেলে বোমা হামলা। এসটি ১৬/০৫। বিবাদী ৪ জন। ৩ জনের এফআরটি ২৩.০৫. ২০০৫। ১নং বিবাদীর বিরুদ্ধে চার্জশীট। বিচার শেষে ২৬.০৬.২০০৮ইং তারিখে বেকসুর খালাস।

৭. বগুড়া যেলার গাবতলী থানায় ০৬.০২.২০০৫ তারিখে চকসাদু গ্রামে বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার। এসটি ৬৬/০৫। বিবাদী ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। চার্জশীট। বিচার শেষে বেকসুর খালাস ৩০.০৯.২০১০ইং।

৮. নওগাঁ যেলার রাণীনগর থানায় ২৮.০৫.২০০৪ তারিখে খেজুর আলী হত্যা মামলা। এসটি ২১/০৫। বিবাদী ৪ জন। এফআরটি ০৫.০৭.২০১১ইং।

৯. বগুড়া যেলার শাহজাহানপুর থানায় ১৫.০২.২০০৫ তারিখে লক্ষ্মীকোলা গ্রামে নাট্যানুষ্ঠানে বোমা হামলা। বিবাদী ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। চার্জশীট। বিচার শেষে বেকসুর খালাস ৩১.০৭.২০১১ইং।

১০. বগুড়া যেলার শাহজাহানপুর থানায় ১৫.০২.২০০৫ তারিখে লক্ষ্মীকোলা গ্রামে নাট্যানুষ্ঠানে বোমা হামলায় একজনকে হত্যা মামলা। চার্জশীট। বিচার শেষে বেকসুর খালাস ২০.১১.২০১৩ইং।

মোট এফআরটি ৩ জনের ৭টি মামলায় ৭টি। বাকী প্রধান বিবাদীর ১০টি মামলায় এফআরটি ৬টি এবং চার্জশীট ৪টি। যেগুলিতে বিচার শেষে বেকসুর খালাস।

উপরের বিবরণে দেখা যাচ্ছে যে, ১৬ই ফেব্রুয়ারী'০৫ বুধবার দিবাগত রাতে বিবাদীগণ এক সাথে নওগাঁ যেলার পোরশা থানা ব্রাক ব্যাংক অফিসে ডাকাতি করে একই রাতে সিরাজগঞ্জ যেলার উল্লাপাড়া থানার নেওয়ারগাছা গ্রামীণ ব্যাংকে ডাকাতি করেছেন। অতঃপর সে রাতেই রাজশাহী ফিরে পরদিন সকাল ৯-টায় সংগঠনের পক্ষ হ'তে শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান বিবাদী ভাষণ দিয়েছেন। কি চমৎকার এই দেশ! আরও দেখা যাচ্ছে যে, বগুড়া যেলার লক্ষ্মীকোলা নাট্যানুষ্ঠানে বোমা হামলা মামলায় বেকসুর খালাস পাওয়া সত্ত্বেও এবং একই বাদী ও সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও উক্ত বোমায় নিহত ব্যক্তির হত্যা মামলা থেকে বিবাদীকে খালাস পেতে আরও ২ বছর ৩ মাস ২০ দিন অপেক্ষা করতে হয়। এটাই হ'ল এদেশে ন্যায় বিচারের স্বরূপ। অথচ প্রকৃত হত্যাকারীর খোঁজ পুলিশ নেয়নি এবং আজও তা অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো উইকিলিক্সের ফাঁস করা রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকার তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস কর্তৃক ২০০৫ সালের ২০শে এপ্রিল বুধবার আমেরিকায় তার সরকারের নিকট মামলার প্রধান বিবাদী সম্পর্কে প্রেরিত গোপন রিপোর্টে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, We want him at least 14 years to let this movement die down. 'আমরা চাই তাকে কমপক্ষে ১৪ বছর জেলে রাখতে। যাতে এই আন্দোলন মরে নিঃশেষ হয়ে যায়'। অতএব মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এইসব মিথ্যা মামলার পিছনে কেটে গেছে ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন। হাজত খাটতে হয়েছে ৩ জনকে ১ বছর ৪ মাস ১৭ দিন এবং প্রধান বিবাদীকে ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন। সরকারের ও বিবাদী পক্ষের ব্যয় হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা ও হাযার হাযার কর্মঘণ্টা। বিপর্যস্ত হয়েছেন বিবাদীগণের পরিবার ও শুভাকাঙ্খীরা। ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে তাঁদের দেশে ও বিদেশে। প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে প্রশাসন ও বিচার বিভাগ। রাষ্ট্র হারিয়েছে তার সুনাম। আল্লাহ্‌র বিচারের কাঠগড়ায় একদিন সবাইকে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ দেশকে হেফাযত করুন- আমীন!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك-

***